মুস্কিল আসান

উপন্যাস

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা - ৬

আড়াই টাকা

বৈশাখ—১৩৬০

কবি-বন্ধু

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

করকমলেষু

[illegible]৭, বেণীনন্দন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বৈশাখ, ১৩৬০

সৌরীন্দ্র

মুস্কিল আসান

— গ্রন্থকার প্রণীত অন্যান্য পুস্তক —

জনৈকা (মোপাসাঁর অনুবাদ)	২॥০
অসাধারণ (টুর্গেনিভের অনুবাদ)	২৲
রাঙ্গামাটির পথ	৩৲
অস্বীকার	২৲
আঁধি	৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা

—গল্প ও উপন্যাস—

প্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত

প্রিয় বান্ধবী ৩৲
নিশি-পদ্ম ২॥০
কলরব ২৲
দিবাস্বপ্ন ২৲
তরুণী-সঙ্ঘ ১॥০
অবিকল ১।০
নবীন যুবক ২॥০
ঘুম ভাঙার রাত ১॥০
কয়েক ঘণ্টা মাত্র ২৲
দুই আর দু'য়ে চার ২॥০

পৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত

[illegible] [illegible]॥০ মরা নদী [illegible]॥০
বিবস্ত্র মানব ৪৲ কারটুন ২৲
দেহ ও দেহাতীত ৪৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

স্বয়ংসিদ্ধা ১ম-৩৲, ২য়-৪॥০
কুমারী-সংসদ ২॥০
দুঃখের পাঁচালী ১॥০
ভুলের মাশুল ১॥০
অদৃষ্টের ইতিহাস ২৲
মরুর মাঝারে বারির ধারা ১॥০

উপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

নকল পাঞ্জাবী ২৲

অমরেন্দ্র ঘোষ প্রণীত

দক্ষিণের বিল (১ম) ৪৲

দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

নিশাচর রাজ ৪॥০
চক্রান্তজালে নারী ২৲
চীনের ড্রাগন ৩৲
লণ্ডনের নরক ২॥০

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ঝড়ো হাওয়া ২॥০

রামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

কাল-কল্লোল [illegible]॥০

পুষ্পলতা দেবী প্রণীত

মরু-তৃষা ৩॥০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

নীলকণ্ঠ ২৲
তিনশূন্য ৩৲

আশালতা সিংহ প্রণীত

মধুচন্দ্রিকা ২॥০
ক্রন্দসী ১॥০ স্বয়ম্বরা ২৲
কলেজের মেয়ে ২৲
লগন ব'য়ে যায় ১৸০

শান্তিসুধা ঘোষ প্রণীত

১৯৩০ সাল ২॥০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,—২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

মুস্কিল আসান

১

কলকাতা থেকে ট্রেনে যেতে সাত-আট ঘণ্টার পথ—রাধানগর। বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে থাকেন জমিদার মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী—বয়স ষাট-বাষট্টি বছর—বিপত্নীক। মথুরামোহনের এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে বড়…মেয়ের নাম শচী—বিবাহ হয়েছে। জামাই কিরণ মুখুয্যে কাণপুরের এক বড় অফিসে ম্যানেজার। শচী আর কিরণ থাকে কাণপুরে। ছেলের নাম বাসুদেব—বয়স উনিশ-কুড়ি বছর—জোয়ান চেহারা—ডন-বৈঠক করে—গাছপালার সখ আছে। এবারে সে ম্যাট্রিক এগজামিন দেছে রাধানগরের ইস্কুল থেকে।

একালে বাস করলেও মথুরামোহনের মন আছে সেই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমোল আঁকড়ে। সনাতন আচার-নিষ্ঠা মেনে চলেন পরিপূর্ণ ভাবে। এ বাড়ীতে বরফ বা বিলাতী জল এখনো ঢোকেনি। রোগে এ্যালোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথির আশ্রয় নেওয়া হয় না। জমিদারী-পৃষ্ঠপোষকতায় আছে ভেষজালয়—সেখানকার কবিরাজ করেন চিকিৎসা। এ কবিরাজের চিকিৎসার অধিকার পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। রাজার ছেলে যেমন জন্মগত অধিকারে পায় সিংহাসন—এ ভেষজালয়ে তেমনি কবিরাজের ছেলে হলেই কবিরাজের মৃত্যুর পর সে হয় ভেষজালয়ের বৈদ্যরত্ন—তা আয়ুর্ব্বেদ-বিজ্ঞানে তার কোনো রকম অনুপ্রবেশ থাক, আর না-থাক! যদি কেউ প্রশ্ন করেন, এমন কবিরাজের ভেষজ-সেবনে রোগ কি

কখনো ইত্যাদি? তাহলে বলবো, পরমায়ুর জোর থাকলে রোগী বাঁচে—মানুষ মরে না—কিছুতেই না! ওষধগুলো আসে ক্যাটালগী অর্ডারে কলকাতা থেকে।

বাড়ীর বাগানও মস্ত বাগান। বাগানের এক প্রান্তে শ্যামসুন্দর বিগ্রহের মন্দির। মন্দির এবং মন্দিরের বিগ্রহ—কতকাল পূর্ব্বে এ-বংশের কোন্ পূর্ব্বপুরুষ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন—তার সাল-তারিখ মন্দিরের পাথরে-বাঁধানো সিঁড়িতে বা দেওয়ালে পাথরের ফলকে লেখা নেই,—কারণ এ ভাবে নিজের কীর্ত্তি-ঘোষণার বুদ্ধি মন্দির-প্রতিষ্ঠার যুগে কারো মাথায় জাগতো না! মানে, মন্দির এবং বিগ্রহ বহুপ্রাচীন—এবং বাড়ীর মেয়েরা বিগ্রহের পূজার আয়োজন করে আসছেন এ গৃহে চিরকাল। মথুরামোহনের স্ত্রী যতকাল বেঁচে ছিলেন, মন্দির এবং বিগ্রহের সেবার ভার ছিল তাঁর হাতে! তাঁর মৃত্যুর পর গৃহে কুলমহিলার অভাব-হেতু মাহিনা-করা পুরোহিত এবং তার সহকারী দু-চারজন ব্রাহ্মণের হাতে পড়লো মন্দির এবং বিগ্রহের সেবার ভার! মেয়ে শচী বিবাহের পর স্বামী-গৃহবাসিনী—কাজেই এ ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না।

মথুরামোহনের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন—সেটুকু না বললে আমাদের এ আখ্যায়িকার মর্ম্ম-অনুসরণে পাঠক-পাঠিকার অসুবিধা হতে পারে! অর্থাৎ উঁর রোগের বাতিক চিরকাল—শরীরং ব্যাধি-মন্দিরং—এ শাস্ত্র-বাক্যে তাঁর অখণ্ড বিশ্বাস; এবং এই বিশ্বাসের জন্যই কোনরূপ রোগ না থাকলেও তিনি রোগের আশঙ্কায় সব সময়ে কাতর। দুটো উদ্গার উঠলেই কবিরাজ আসেন—বায়ুর আধিক্য! উদ্গারের বিচিত্র ব্যঞ্জনায় অম্ল-পিত্তাদির বৈলক্ষণ্য বুঝে ভেষজ প্রয়োগ। স্ত্রী মারা যাবার পর উপসর্গগুলো এমন বেড়ে উঠলো যে কবিরাজকে ডেকে আনবার বিলম্ব ঘোচাবার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে—খাশ-ভৃত্য বটার

কাঁধে সব সময়ে ঝোলানো ক্যাম্বিশের একটি ব্যাগ—সেই ব্যাগের মধ্যে নানা সাইজের কাগজের কৌটোয় সব সময়ে মজুত থাকে লাল, সবুজ, কালো, সাদা কবিরাজী বড়ি। মথুরামোহনের নির্দ্দেশে বটা লাল সাদা প্রভৃতি থেকে যথাযোগ্য বড়ি বার করে মথুরামোহনের হাতে দেয়।…

এমনি ভাবেই এ সংসার চলছে বাঁধা রুটিন মেনে।

মথুরামোহনের একান্ত স্নেহের সঙ্গী আর সহচর বলতে আছেন বাচস্পতি-মশায়। বয়সে তিনি মথুরামোহনের চেয়ে কিছু-ছোট। এ বাড়ীর আনুকূল্যে বাচস্পতির বাবার টোল চলতো—বাচস্পতির পিতার মৃত্যুর পর টোল বন্ধ হয়—কারণ এযুগে ব্যবসা-বুদ্ধি মানুষের মনে প্রবল ভাবে জেগে ওঠার দরুণ টোলে পড়ার দিকে কারো মন নেই—ইংরেজী স্কুলে পড়ে কোনো মতে ইংরেজী গ্রামার-ইডিয়মগুলো আয়ত্ত করে অফিসের চাকরির দিকে সকলের ঝোঁক! টোলের জন্য যে ব্যয় পূর্ব্বপুরুষের দলিলে বরাদ্দ, সেটা বাচস্পতি পান—দলিলের সর্ত্ত-মতে। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ। প্রত্যহ তাঁকে শাস্ত্র-পুরাণ পড়ে শোনাতে হয় মথুরামোহনকে—মথুরামোহন তাঁকে স্নেহ করেন এবং এ পরিবারের সঙ্গে বাচস্পতির সম্পর্ক প্রায় নাড়ীর সম্পর্কের মতো অন্তরঙ্গ এবং আন্তরিক হয়ে বেড়ে উঠেছে। বাচস্পতি সুরসিক। মথুরামোহনের ছেলেমেয়ে তাঁকে দেখে সমবয়সী বন্ধুর মতো। মথুরামোহনের সঙ্গী-সহচর হলেও বাচস্পতির মন সেকেলে আচার-নিষ্ঠাকে মথুরামোহনের মতো আঁকড়ে থাকতে পারেনি—না পারলেও মথুরামোহনের মনে ব্যথা লাগে, এমন কাজ তিনি করেন না!

২

যেদিনের যে-ঘটনা অবলম্বন করে আমাদের আখ্যায়িকা সুরু, সেই কথা বলি :

সকালবেলা···বাগানের প্রান্তে শ্যামসুন্দরের ছোট মন্দির। মন্দিরটি ছোট হলেও বেশ পরিপাটী ছাঁদে তৈরী। মন্দিরে কালো কষ্টি-পাথরের তৈরী শ্যামসুন্দর তাঁর পাশে কষিতকাঞ্চনবর্ণা শ্রীরাধার মূর্ত্তি। বিগ্রহটি এক হাত উঁচু। কারুখচিত সিংহাসনে বিগ্রহ সংস্থাপিত। মন্দিরের সঙ্গে লাগাও কালো আর সাদা পাথরে বাঁধানো সুপরিসর ঢাকা বারান্দা।

সকালে বিগ্রহের সামনে আসনে বসে মথুরামোহন নিমীলিতনেত্রে শ্যামসুন্দরের ধ্যানে নিমগ্ন। মন্দিরে ধূপ-ধূনার গন্ধ···বেতনভোগী দুজন ব্রাহ্মণ—একজন চন্দন ঘষছে, আর-একজন তামার বড় থালায় ফুল আর নৈবেদ্য সাজাচ্ছে।

বাহিরে বাগানে ছেলে বাসু। তার গাছপালায় সখ—মালীকে নিয়ে কতকগুলো ভালো গাছপালার তদ্‌বির করছে, এমন সময় রাখালের হাতে ছাড়া পেয়ে বাড়ীর একটা গরু পরমানন্দে সদ্য-জেগে-ওঠা কতকগুলো চারা গাছ খেতে সুরু করলো। কাজ করতে করতে বাসুর পড়লো নজর! অমনি সে চীৎকার করে উঠলো,—এই···এই···আরে, আমার নতুন চারাগাছগুলো সব মুড়িয়ে খেয়ে ফেল্‌লে! ওরে ধর্ ধর্ এখনি গিয়ে··· তাড়া, তাড়া, মালী!

ছোট-মনিবের কথায় হেই-হেই করে মালী ছুটলো গরু তাড়াতে।

গরু যাবে কেন? আদরে-যত্নে পোষা···তাছাড়া সে জানে, উদ্ভিদের উপর তার জন্মগত দাবী এবং অধিকার! মালীর মুখের ভর্ৎসনায়

সে এতটুকু বিচলিত হলো না···নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত মনে গাছের চারা মুড়োচ্ছে!

বাসুর অসহ্য বোধ হলো! কাছে পড়েছিল ক'খানা বাঁখারি। তার একখানা তুলে হেই-হেই করে সে ছুটলো গরুকে মারতে। বাঁখারির ঘা খেয়ে গরুর সাড়া জাগলো। সামনের দুপা তুলে লাফাতে লাফাতে সে উঠলো গণ্ডীঘেরা একটা পটীর উপর। পটীতে কতকগুলো মরশুমী ফুলের চারা সদ্য মাথা তুলে জাগান দেছে। গরুর পায়ের চাপে সেগুলোর গয়া-প্রাপ্তি! গালাগাল দিতে দিতে বাসুর তাড়া···সঙ্গে সঙ্গে মালীর চীৎকার। সকালের স্নিগ্ধ শান্তি ফাঁশিয়ে বেশ হৈ-হৈ রব! মন্দিরে মথুরামোহনের ধ্যান-ভঙ্গ! তাঁর ভ্রূযুগ হলো কুঞ্চিত। তিনি ডাকলেন—বটা···

মন্দিরের বাহিরে দালানে খাশ-ভৃত্য বটা আছে মোতায়েন। ছায়ার মতো বটা মথুরামোহনের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। মথুরামোহনের রোগের বাতিক উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, খেতে শুতে···একটা-না-একটা উপসর্গ লেগেই আছে! পাঁজরার নীচে হয়তো খচ্ করে উঠলো···পর-পর গোটা পাঁচ-সাত ঢেঁকুর উঠলো···মাথা দপ্-দপ্ রগ ঝন্ঝন্ হেঁচকি··· এমনি—এর যেন বিরাম নেই! এবং এসব উপসর্গে সাবেক কবিরাজ-মশায় বিশ-বাইশ রকমের বড়ি দিয়েছেন, গুঁড়ো দিয়েছেন, কত-রকম গাছ-গাছড়ার শিকড় দিয়েছেন—এক-একটি উপসর্গে এক একটি ঐ দাওয়াই! কখন কোন্ উপসর্গ ঘটে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই, কাজেই বটার কাঁধে ঝুলোনো ক্যাম্বিশের থলি এবং সেই থলির মধ্যে আছে আলাদা আলাদা কৌটোয় এই সব বড়ি, গুঁড়ো, গাছগাছড়ার শিকড়! যস্মিন উপসর্গে যা বিধি!

মথুরামোহনের ডাকে বটা এসে দাঁড়ালো মন্দিরের দরজার সামনে।

বাহিরে ওদিকে বাসুর চীৎকার—মার্-মার্, ঠ্যাঙা বেটাকে···আমার নতুন গাছগুলো সব···সেই সঙ্গে মালীর চীৎকার—ভাগ্, ভাগ্ হা-রা-রা-রা-রা···

মন্দিরে আসনে বসে মুখ ফিরিয়ে মথুরামোহন দেখলেন বটাকে—তাঁর বুকের মধ্যে রীতিমত ধক্‌ধকানি! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কিসের গোলমাল ও?

সেইখানে দাঁড়িয়েই বটা চোখে যা দেখলো, কর্ত্তাকে দিলে তার রিপোর্ট···খুব সংক্ষেপে—আজ্ঞে দাদাবাবু···গরু···

কর্ত্তা চমকে উঠলেন! বললেন—দাদাবাবু গরু!

বটা বললে—আজ্ঞে না, দাদাবাবু গরু নয়···দাদাবাবু গরু ঠেঙাচ্ছেন।

কথা শুনে কর্ত্তা আসন ছেড়ে উঠলেন—মন্দিরের বাহিরে এলেন—এসে দেখেন, বাগানে মঙ্গলা-গাই ছুটেছে প্রাণভয়ে পুচ্ছ তুলে, তার পিছনে বাসু···বাসুর হাতে বাঁখারি···বাসু মার-মূর্ত্তি!

কী অনাচার! মথুরামোহন ডাকলেন বেশ জোর-গলায়—বাসু···

বাসুকে যেন ইলেকট্রিক রড্ ছোঁয়ানো হলো! বাসু থমকে দাঁড়ালো; দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো।

ভর্ৎসনার সুরে মথুরামোহন বললেন—সক্কালবেলা গরু ঠেঙাচ্ছ!

পিতার রুদ্র-কঠিন দৃষ্টির সামনে বাসুর কুণ্ঠিত ভাব। অপরাধীর ভঙ্গীতে বাসু বললে—আ—আ—আমার অত-টাকা দামের গাছগুলো একেবারে মুড়িয়ে দেছে!

মথুরামোহনের ভ্রূকুঞ্চিত! বিরক্তিভরা কণ্ঠে তিনি বললেন—দিক্! তাবলে গরুকে ঠেঙাবে?···গরু···গো-মাতা···সাক্ষাৎ ভগবতী! সেই ভগবতীকে পীড়ন।

বিনম্র-ভঙ্গীতে বাসু জানালো—আজ্ঞে, ভগবতী ভাবলে আমার অমন সব গাছ…

বাধা দিয়ে মথুরামোহন বললেন—হ্যাঁ, সব গাছ খাবে।

বাসুদেবের দু'চোখে বিস্ময়! সেই ডগা-মুড়োনো গাছগুলোর পানে চেয়ে হতাশা-জড়িত কণ্ঠে বাসু বললে—খাবে?

মথুরামোহন বললেন—খাবে। এ-সব তোমাদের এই পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল!…নিজেদের সনাতন আদর্শ, সংস্কার সব বিসর্জ্জন দিয়ে… জানো…এই গরুর দেহে তেত্রিশ কোটি দেবতার বাস?

স্খলিতকণ্ঠে বাসু বললে—তেত্রিশ কোটি দেবতা!

মথুরামোহন বললেন—হ্যাঁ। গরু ভগবতী…মনে রেখো। এ-সব অনাচার আমি…

তারপর তর্জ্জনী তুলে আদেশের ভঙ্গীতে তিনি দিলেন নির্দ্দেশ—যাও।

অত্যন্ত অপরাধীর মতো ধীর পায়ে বাসু গেল অন্যদিকে…মথুরামোহন ঢুকলেন মন্দিরের মধ্যে।

ক'পা এগিয়ে এসে একটা ঝোপ—তারপর সিঙাপুরী কলার পটী। গাছগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে…সবুজ চিকন পাতাগুলো সকালের রোদে ঝকঝক করছে—কটা গাছে কাঁদিও বেশ ধরেছে…গরুটা ওদিকে তাড়া খেয়ে এদিকে শ্যামল কদলী-কুঞ্জে আবার রসনার তৃপ্তি-সাধনে রত—মালী তাকে খোঁচা দিচ্ছে—এই হেট্ হেট্ হেট্ হেট্…

দেখে বাসুদেব মালীকে করলো নিষেধ—ওরে, খবর্দ্দার! গরুকে কিছু বলবি নে।

মালী অবাক! ছোট মনিবের পানে ফিরে তাকালো। বাসু বললে—গরু…গো-মাতা…ভগবতী!

বলেই দু'হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে বাসু কপালে ঠেকালো।

ঠিক সেই সময়ে ফটকের দিক থেকে বাচস্পতি-মশায়ের প্রবেশ—তাঁর হাতে একখানা খবরের কাগজ। বাসুকে কৃতাঞ্জলি-পুটে নমস্কার করতে দেখে বাচস্পতি হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন—কি দাদা, প্রাতঃ-সূর্য্যকে এত বেলায় প্রণাম!

কপাল থেকে হাত নামিয়ে হাসতে হাসতে বাসু দিলে জবাব—প্রাতঃ-সূর্য্যকে নয়! আমি প্রণাম করছি গরুকে।

বাচস্পতি বললেন—গরুর উপর হঠাৎ এত ভক্তি?

কণ্ঠ যথাসম্ভব গম্ভীর করে বাসু বললে—হেসো না, বাচস্পতিদা। গরুকে তুচ্ছ করছো কি?...গো-মাতা...ভগবতী! ওঁর দেহে তেত্রিশ কোটি দেবতা! তাই ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতাকে একসঙ্গে...বলেই সে হেসে ফেললো।

হাসতে হাসতে বাচস্পতি বললেন—তা' এ পুণ্যের ফলও হাতে হাতে...

কথাটা বলে খবরের কাগজখানা তিনি বাসুর হাতে দিলেন; দিয়ে বললেন—তোমার পাশের খবর বেরিয়েছে।

আনন্দে বাসুর দু'চোখ প্রদীপ্ত।—ও!—ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে! পাশ করেছি? বলেই কাগজে-ছাপা রেজাল্টের দিকে দৃষ্টি।

বাচস্পতি বললেন—হ্যাঁ। ফার্ষ্ট ডিভিশন।

আনন্দে বাসু লাফিয়ে উঠলো। কাগজে ফার্ষ্ট ডিভিশনে নিজের নাম ছাপা দেখে সে বললে—সকালে এমন সুখবর দিলে বাচস্পতিদা, তোমাকে আমি...

হেসে বাচস্পতি বললেন—মাথায় তুলে নাচতে চাও?...কিন্তু আমি তাতে রাজী নই! এসো কর্ত্তার কাছে...তাঁকে এ সুখবর...

দু'চোখে আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে বাসু বললে—ওরে বাবা, আমি? না...সদ্য তাঁর ভগবতীকে ঠেঙিয়ে বকুনি খেয়েছি...

বাচস্পতি বললেন—কর্ত্তা এখন ?

—মন্দিরে।

—ও! বাচস্পতি তাকালেন মন্দিরের দিকে। কানে ভেসে এলো মথুরামোহনের কণ্ঠে নাম-কীর্ত্তন—

গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপিনাং গোপনায়কং···

বাসুদেবও শুনলো।

বাচস্পতি বললেন—ওঁর পূজা তাহলে হয়ে গেছে!

বাসুদেব বললে—হ্যাঁ। তুমি যাও বাচস্পতিদা, আমি যাবো না। এ খবর দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই কথাটা···

বাচস্পতি তাকালেন বাসুদেবের পানে একাগ্র-দৃষ্টিতে···মনের গহনে ক্ষণেকের জন্য সেই কথার সন্ধান! তখনি মনে পড়লো। তিনি বললেন—মানে, তোমার কলকাতার কলেজে পড়তে যাওয়া?

মাথা নেড়ে বাসুদেব জানালো—হ্যাঁ।

বাচস্পতি বললেন—তা বেশ তো, তুমিও চলো।

বাসুদেব বললে—আমি যাবো না। তুমি যাও বাচস্পতিদা···লক্ষ্মীটি··· যেমন করে পারো, বাবাকে বলে কলকাতার কলেজে পড়া···

ঈষৎ দ্বিধাভরে বাচস্পতি বললেন—কিন্তু মুস্কিল দাদা···ওঁকে তো জানো! সেকালের যত সনাতন বিধি-নিষেধ-সংস্কার আঁকড়ে বসে আছেন! ওঁর বিশ্বাস, কলেজে পড়েই আমাদের দেশটা ম্লেচ্ছ হয়ে যাচ্ছে! আর উনি পাঠাবেন নিজের ছেলেকে সেই কলকাতায় কলেজে পড়তে··· ম্লেচ্ছ হবার জন্য!

বাসুদেব বললে—ও তো বাবার বাতিক! না···না···বাচস্পতিদা··· লক্ষ্মীটি···বাবাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যেমন করে পারো, আমার কলকাতায় গিয়ে কলেজে পড়ার ব্যবস্থা চাই।

নিশ্বাস ফেলে বাচস্পতি বললেন—দেখি···তোমার ভাগ্য···আর আমার হাতযশ !

বাসুদেব বললে—তোমার হাতযশ নয় বাচস্পতিদা, বলো, বাক্যের যশ···সংস্কৃত শ্লোক !

৩

মথুরামোহনের বসবার ঘরে বৈঠক। মথুরামোহন এবং বাচস্পতি··· দুজনে বাদানুবাদ। বিষয়, বাসুর কলকাতার কলেজে পড়া। ঘরের এক প্রান্তে বাসু বসে আছে···নিস্পন্দ, নির্ব্বাক···একাগ্র-মনে বাদানুবাদ শুনছে।

মথুরামোহনের দারুণ আপত্তি। বাচস্পতি হাজার রকম যুক্তি খাড়া করছেন···সে সব যুক্তি মথুরামোহন তাঁর একমাত্র অমোঘ অস্ত্র···সনাতনী-গদার আঘাতে হঠিয়ে দিচ্ছেন !

মাথা নেড়ে জোর গলায় মথুরামোহন বললেন—না, না, না। এ হতেই পারে না ! কলকাতা ? সেখানে অনাচার আর উচ্ছৃঙ্খলতা··· আমাদের সনাতন আচার-ব্যবহার রীতিনীতি···সেগুলোকে সকলে একেবারে চূর্ণ করে দিচ্ছে ! যত রকম অনার্য্য পান-ভোজন ! কলকাতা সহর আর নরক, দু'য়ে কোনো তফাৎ নেই !

মথুরামোহনের এ কথার উত্তরে বাচস্পতি বিনম্র-কণ্ঠে বললেন—কিন্তু সকলেই কি···

বাচস্পতিকে কথা শেষ করতে না দিয়ে মথুরামোহন বললেন—না। তাছাড়া তুমি জানো বাচস্পতি, রাধানগরে আমাদের বংশে সনাতনী আচার-নীতি কিরকম নিষ্ঠাভরে···এই ধরো, তোমাদের এ কালের কলের

জল, পাঁওরুটি, ডিম, চা, পেঁয়াজ, সিগ্রেট্ এ-সব কেউ এবাড়ীতে কখনো স্পর্শ করে নি! আর, কলকাতায় শুনেছি, এসব না হলে দিন চলে না! শুনেছি, মেয়েরা পর্য্যন্ত সেখানে এখন পথে-ঘাটে হুট্-হুট্ করে···মানে, আব্রুর সব বালাই ছেঁটে দেছে!···আমাদের বংশের ছেলে বাসুকে ঐ কলকাতায়···

উষ্মাভরে মথুরামোহনের কণ্ঠ কেঁপে উঠলো···বক্তব্য তিনি শেষ করতে পারলেন না···গড়গড়ার নলটা ঠোঁটে চেপে ধরলেন।

নস্যদানি থেকে খানিকটা নস্য নিয়ে নাকে গুঁজে বাচস্পতি বললেন— হ্যাঁ, যা বললেন, তা একেবারে অস্বীকার করা চলে না! তবে কিনা বাসু এ বংশের ছেলে···এ বংশের নিষ্ঠার মধ্যে বেড়ে উঠেছে। এ বংশের সনাতন আচার, রীতিনীতি মেনেই সেখানে চলবে! তার উপর মানে, শাস্ত্রে বলছে, জ্ঞানাৎ পরতরং নহি! এবং সেই জ্ঞানলাভের জন্য শাস্ত্র বলছে, মানুষ গন্তব্যং নরকেঽপি চ।

শাস্ত্র এবং সংস্কৃত শ্লোক—মথুরামোহনের কাছে যেন বেদ-বাক্য! সংস্কৃত হলো মুনি-ঋষির ভাষা···এবং সে ভাষার শ্লোক···মথুরামোহন এই শ্লোককে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে মেনে চলেন। বাচস্পতির শ্লোকে জ্ঞানের জন্য মানুষের নরকযাত্রা শুনে তিনি বিস্ময়ে হতভম্ব! গভীরভাবে এ শ্লোক উপলব্ধি করবার জন্য তিনি প্রশ্ন করলেন—তার মানে?

বাচস্পতির দু'চোখে আশা ও আনন্দের দীপ্তি! বাচস্পতি বললেন— এর মানে, জ্ঞানলাভের জন্য বাসুদেব যদি ঐ নরকে···মানে, ঐ কলকাতায় যায়, শাস্ত্রের তাতে নিষেধ দেখছি না! বিশেষ আপনার সনাতন আদর্শ—আপনার ছেলে বাসুদেব কখনো লঙ্ঘন করতে পারে? তার উপর—বাসুদেবের কলকাতায় যাবার উদ্দেশ্য উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, জ্ঞান-লাভ।

মথুরামোহন একাগ্রমনে কথাটা শুনলেন। শুনে গভীরভাবে উপলব্ধির চেষ্টা। তারপর দ্বিধাভরে তিনি বললেন—শাস্ত্র বলছে, জ্ঞান-লাভ! তা বেশ, এখানে থেকেও তো সে-জ্ঞান···বাড়ীতে আমি যদি তার সুব্যবস্থা করে দিই?

বাচস্পতির বুকে যেন ছোট একটি ঢিল পড়লো···বুকের মধ্যে চিন্তার তরঙ্গ! বাস্তুর উপর চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে তিনি তাকালেন মথুরামোহনের দিকে, তাকিয়ে বললেন—হুঁ, তা হয়। কিন্তু আমাদের ভবিষ্য-পুরাণ!··· ভবিষ্য-পুরাণ বলছে···

মথুরামোহনের দু'চোখে আকুল প্রশ্ন! তিনি বললেন—ভবিষ্য-পুরাণ কি বলছে?

বাচস্পতি বললেন—ভবিষ্য-পুরাণ বলছে,

গঙ্গাতীরে কালীক্ষেত্রং বিশ্ববিদ্যামহাপীঠং
তথা হি যুব-ছাত্রানাং তপঃক্ষেত্রং, দ্বিজোত্তম!

শ্লোক শুনে মথুরামোহনের মাথায় রক্ত ছলাৎ করে উঠলো! দৃষ্টি সঙ্কুচিত করে তিনি বললেন—এর মানে?

নস্যদানি থেকে আর এক টিপ নস্য নিয়ে হাত ঝেড়ে নাসাগ্রে গামছা বুলিয়ে বাচস্পতি বললেন—এর মানে অর্থাৎ গঙ্গাতীরে কালীক্ষেত্রং কিনা কালীঘাট অর্থাৎ কলিকাতা!···এত অনাচার সত্ত্বেও ঐ কলকাতাকে যখন যুব-ছাত্রদের তপঃক্ষেত্র বলছে, তখন···

মথুরামোহনের বুকের মধ্যে চিন্তার ঘূর্ণি! একটা নিশ্বাস ফেলে তিনি শুধু বললেন—হুঁ···

তাঁর চোখের সামনে যেন অকূল সমুদ্র! বাচস্পতি আর একবার বাস্তুদেবের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। তারপর মথুরামোহনকে চিন্তান্বিত

দেখে উৎসাহিত কণ্ঠে বললেন—আচ্ছা, আপনার আচার-নিয়ম বিধি-নিষেধ আপনি তার ফিরিস্তি করে দিন।…বাসুদেব সেখানে সেই ফিরিস্তি শিরোধার্য্য করে চলবে। ব্যস্!…তাহলে আর আশঙ্কার কি আছে এতে?

কথাটা মথুরামোহনের মনের মধ্যে কেমন যেন থই পাচ্ছে না! তখনও তিনি চিন্তা করছেন! বাচস্পতির দিকে চেয়ে তিনি আবার বললেন—হুঁ।

সঙ্গে সঙ্গে মস্ত একটা নিশ্বাস…তারপর একটা উকি! বোধ হয়, তামাকের ধোঁয়া বুকের কোনোখানে আটকে গিয়েছিল! উকি উঠতেই মথুরামোহন ডাকলেন—বটা…

কবিরাজী দাওয়াই-এর থলি কাঁধে নিয়ে বটাকে সব সময়ে মোতায়েন থাকতে হয়…কর্ত্তার কখন কি উপসর্গ ঘটে! মনিবের ডাকে বটা সামনে এলো।

খুক্-খুক্ করে কাসতে কাসতে বুকে হাত চেপে একটু কাতর কণ্ঠে মথুরামোহন বললেন—সেই অম্বলের ব্যথাটা যেন…

বাচস্পতি বলে উঠলেন—ও…তাহলে…সেই কালো বড়ি।

ক্যাম্বিসের থলিতে হাত ঢুকিয়ে একগাদা দাওয়াই-এর কৌটো বার করলে বটা…করে সেগুলো ফরাশে রেখে তা থেকে একটি কৌটো বেছে নিয়ে কৌটো থেকে একটা কালো বড়ি বার করে মথুরামোহনের হাতে দিয়ে বললে—আজ্ঞে, এই।

বটার হাত থেকে বড়ি নিয়ে মথুরামোহন সেটা গালে ফেললেন—ফেলে কাছেই পাথরের ছোট চৌকির উপরে ছিল শ্বেতপাথরের গেলাসে জল—সেই জল গলায় ঢাললেন। বড়ি উদরস্থ হলো। তারপর দুমিনিট বুকে হাত বুলিয়ে একটু আরাম পেয়ে মথুরামোহন নিশ্বাস ফেললেন,

আঃ! নিশ্বাস ফেলে বললেন—হ্যাঁ, তুমি কি বলছিলে বাচস্পতি, ঐ··· গঙ্গাতীরে ছাত্রদের কুরুক্ষেত্র···

মৃদু হেসে বাচস্পতি বললেন—আজ্ঞে না, কুরুক্ষেত্র নয়, কালীক্ষেত্র।

অনুচ্চ কণ্ঠে মথুরামোহন মন্তব্য করলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কালীক্ষেত্র! কালীক্ষেত্র!···গঙ্গাতীরে কালীক্ষেত্র···তারপর চিন্তার চকিত চমক। পরক্ষণেই একটু আশ্বাসভরা কণ্ঠে—আচ্ছা, গঙ্গাতীরে কালীক্ষেত্র শাস্ত্র বলেছে! তা এ কালীক্ষেত্র···কালীঘাট না হয়ে দক্ষিণেশ্বর হতে পারে তো।

স্থির জলে নুড়ি পড়লে যেমন তরঙ্গের ঘূর্ণি ওঠে, মথুরামোহনের এ-কথায় বাচস্পতির মনে চিন্তার তেমনি ঘূর্ণি! তাঁর ললাট কুঞ্চিত··· এক-টিপ নস্য নিয়ে তিনি বললেন—হ্যাঁ···দক্ষিণেশ্বর! তা···

মথুরামোহন বললেন—হ্যাঁ, সেখানেও তোমার গঙ্গা এবং কালী···

বাচস্পতির মাথায় চাকা ঘুরছে। সে চাকা থামলো। উৎফুল্ল কণ্ঠে বাচস্পতি বলে উঠলেন—হ্যাঁ···কিন্তু ঐ বিশ্ববিদ্যা-মহাপীঠ?

মথুরামোহন যে কূলটুকু পেয়েছিলেন, বাচস্পতির এ কথা জলস্রোতের মতো সে কূলটুকুকে আবার ডুবিয়ে দিলে! তিনি আবার···

বাচস্পতি সতেজে বলতে লাগলেন—তাহলেই দেখছেন, দক্ষিণেশ্বর নয়! শাস্ত্র ঐ কলকাতার কথাই বলছে। কেন না, কালীক্ষেত্র এবং বিশ্ববিদ্যা-মহাপীঠ···এ দুটিই ঐ কলকাতায়! সুতরাং···

মথুরামোহন যেন অথৈ-জলে আঁকুপাঁকু করছেন! তাহলে? নিরুপায় অসহায় কণ্ঠে তিনি বললেন—হুঁ···তোমার ভবিষ্য-পুরাণ বলছে···জ্ঞান-লাভ···কলকাতা! তা বেশ, তাহলে বাসুদেব কলকাতাতেই জ্ঞান-লাভ করুক···কিন্তু সেখানে তার থাকা হবে না।

বাসুদেব এতক্ষণ যেন নিঃশব্দে বসে ম্যাচ দেখছিল···তার পার্ট

তোফা বল নিয়ে চলেছে···ওদলের খেলোয়াড়দের সকল বাধা কাটিয়ে··· মনে পরমানন্দ···এবারে নির্ঘাত গোল! বাপের শেষ কথায় তার আনন্দ হলো ম্লান। সে ভাবলো, এই রে···বাচস্পতিরও ভ্রূ হলো উৎকণ্ঠায় সঙ্কুচিত! নাকে আর এক টিপ নস্য গুঁজে তিনি প্রশ্ন করলেন—তাহলে?

একটা নিশ্বাস ফেলে মথুরামোহন বললেন—দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার ধারে আমার কেনা ঐ বাড়ী আর বাগান খালি পড়ে আছে—বাসুদেব সেই বাড়ীতে থেকে কলকাতার কলেজে পড়বে। আর হ্যাঁ···কলেজ যাওয়া-আসা ছাড়া কলকাতার সঙ্গে তার আর কোনো সংস্রব রাখা চলবে না।

যাকে বলে দুর্যোগে যে-কোনো আশ্রয়! অর্থাৎ এনি পোর্ট ইন ষ্টর্ম···বাচস্পতি এবং বাসুদেব সেই আশ্রয় পেয়ে আরামে নিশ্বাস ফেললেন। বাচস্পতি বললেন—বাঃ, বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা!

তিনি আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন—বলা হলো না। বাধা দিয়ে মথুরামোহন বললেন—আর হ্যাঁ···তুমি যে কথা বলছিলে···আমাদের সনাতন রীতিনীতি আচার বিধিনিষেধ···

সোৎসাহে বাচস্পতি বললেন—ঠিক কথা! আপনি সেগুলোর ফিরিস্তি করে দিন। বাসুদেব অক্ষরে অক্ষরে সে সব সেখানে মেনে চলবে।

এইটুকু বলে বাচস্পতি তাকালেন বাসুদেবের দিকে, বললেন—তুমি নিজের হাতে সব লিখে নাও বাসু···পরক্ষণেই মথুরামোহনের দিকে চেয়ে উক্তি—আপনি বলুন।

বাসুদেব কাগজ কলম নিয়ে বসলো এবং মথুরামোহনের নির্দ্দেশে লিখতে লাগলো।

মথুরামোহন ফিরিস্তি বলে চললেন—প্রত্যহ সন্ধ্যা-আহ্নিক করিব—মাথার শিখা রক্ষা করিব। বরফ, চা, বিলাতি জল, পাঁওরুটি, পেঁয়াজ, ডিম, মুরগী, সিগ্রেট প্রভৃতি ম্লেচ্ছ দ্রব্যাদি খাইব না; এবং···

সুদীর্ঘ ফিরিস্তি। মথুরামোহন বলছেন, বাসুদেব লিখে যাচ্ছে… যেন বেদব্যাস কথক এবং সে কথার লেখক গণেশ-ঠাকুর! বাচস্পতি নাকে ঘন ঘন নস্য গুঁজছেন…কৌতুকে তাঁর দু'চোখ জ্বল জ্বল করছে…

•

কলকাতায় আছেন বংশগোপাল…পেশায় এটর্ণি…মথুরামোহনের সুহৃদ। বংশগোপাল তাঁর মতো এতখানি না হলেও রীতিমত সনাতনপন্থী। ব্যবসা-বুদ্ধিতে পোক্ত হয়েও তিনি সনাতন সংস্কারে আস্থা রাখেন। সকালে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে স্নান করে সব-আগে করেন পূজা-আহ্নিক; তারপর বৈষয়িক কাজে অবতীর্ণ হন। অফিসের খাশকামরায় আইনের কেতাব, মক্কেলদের দলিল-দস্তাবেজ, মামলা-মকর্দ্দমার কাগজপত্র, ডে-বুক, বিল-বুক প্রভৃতির সঙ্গে গীতা, উপনিষদ, মায় পঞ্জিকা এবং জ্যোতিষ-রত্নাকর কেতাব ও সমান-আদরে-মর্য্যাদায় বিরাজ করছে।

তাঁর সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করে তাঁর অভিভাবকতায় বাসুদেবকে কলেজে পড়তে পাঠাবার ব্যবস্থা হলো। এ ব্যবস্থায় বাসুদেবের জ্ঞান-লাভ এবং আচার-রক্ষা সমভাবে চলবে বলে মথুরামোহনের মনে হলো আশা। এবং স্থির হলো দক্ষিণেশ্বরের বাড়ী বাগান বংশগোপাল মেরামত করিয়ে রাখবেন; বাসুদেব সেই বাড়ীতে গিয়ে থাকবে—তার সঙ্গে থাকবে বাড়ীর বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য মধু আর পাচক রঘু-ঠাকুর। বংশগোপাল সেখানে বাসুদেবকে শুধু কলেজে ভর্ত্তি করিয়ে দেবেন না—তিনি হবেন বাসুদেবের গার্জ্জেন।

পাঁজি দেখে যাত্রার দিন স্থির হলো। বাচস্পতি ষ্টেশনে গিয়ে বাসুদেবকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলেন। যাত্রাকালে বাচস্পতি মথুরামোহনের সামনে বাসুদেবকে বার-বার হুঁশিয়ার করে দিলেন, ঐ-ফিরিস্তির বিধি-নিষেধ—সেখানে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা চাই!

বাচস্পতির সে কথার জের ধরে নিশ্বাস ফেলে মথুরামোহন বললেন—হ্যাঁ—তার নড়চড় হলে তখনি তোমার পড়া হবে বন্ধ···তোমাকে এখানে চলে আসতে হবে।

৪

দক্ষিণেশ্বরের বাড়ী···বাগান। অফিসের বাঁধা কনট্রাক্টরের হাতে বংশগোপাল দেছেন ভার; এবং সাধারণতঃ এ-সব কনট্রাক্টরের হাতে যা হয়···মানে, কোনোমতে ফাঁকির দাগরাজি আর জোড়াতালি অথচ ফাঁপা বিল! তার উপর যে-কাজ দশদিনে হবার কথা, তাতে তিন-তিরিক্ষে ত্রিশদিন সময় লাগে—এক্ষেত্রেও তার এতটুকু ব্যতিক্রম হলো না। সহরের এই ফাঁকিবাজি কাজের সঙ্গে বাসুদেবের পরিচয় ছিল না। কাজেই বাড়ী আর বাগানের হাল দেখে তার চক্ষুস্থির! বংশগোপাল পেশায় এটর্ণি। চতুর মানুষ। তিনি বুঝলেন—বাসুদেবের হতভম্ব ভাব দেখে। তিনি বোঝালেন—হেঁ হেঁ বাড়ীখানা আমিই জোর করে তোমার বাবাকে তখন কিনিয়ে দিয়েছিলুম—ইলেকট্রিক শুদ্ধ! এমনি পড়েছিল বেমেরামতিতে···অনেক বলেছিলুম, মেরামত করে ভাড়া দেবার জন্য। তা উনি কিছুতেই রাজী হলেন না। বললেন—না, কাকে ভাড়া দেবো?···অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে বাড়ীতে অনাচার করবে! তা যাক্! ভাগ্যে খালি ছিল, তাই তোমার থাকবার সুবিধা হলো।

বাসুদেব এ-কথার কোনো জবাব দিলে না···কেমন এক-রকম বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে শুধু তাকিয়ে রইলো বংশগোপালের পানে।

সে দৃষ্টির মর্ম্ম বংশগোপাল কি উপলব্ধি করলেন, জানি না! তিনি বললেন—এই জঙ্গল দেখে ঘাবড়ো না বাবা, আমি যখন ভার নিয়েছি,

সব ঠিক করে দেবো···হেঁ হেঁ, তোমার বাবার সঙ্গে এটর্ণির সম্পর্ক নয়···তিনি আমার বাল্যবন্ধু। তাছাড়া এখানে আমিই তোমার গার্জ্জেন। যখন যা দরকার হবে···লজ্জা নয়···আমাকে খুলে বলবে।

বংশগোপাল এ-কথার একটু উত্তর যেন আশা করেছিলেন! কিন্তু এবারও বাসুর মুখে কোনো জবাব পেলেন না। বেলা হয়ে যাচ্ছে··· অফিস আছে···কোথায় দক্ষিণেশ্বর আর কোথায় সেই ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট! তিনি বললেন—আচ্ছা, এখন তাহলে আসি। কাল আমার ক্লার্ক এসে তোমাকে নিয়ে গিয়ে কলকাতার কলেজে ভর্ত্তি করিয়ে দেবে।

এ-কথা বলে এটর্ণি বংশগোপাল মোটরে চড়ে বিদায় নিলেন। তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে বাসু এসে দাঁড়ালো বাড়ীর সামনের বাগানে। মধু দাঁড়িয়ে আছে যেন কাঠ! ছোট মনিবকে সামনে দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করে সে বললে—বাড়ী যা সারিয়েছেন···কোণে একটা ভারা হুই···আর বাগান তো নয়, আগাছার জঙ্গল! কত সাপখোপ যে আছে!···মালী রেখেছেন···ঐ তার চেহারা! হাড় জির্‌জির্ করছে···বুড়ো···রোগা পট্‌কা! এ জঙ্গল সাফ করবে! ওর যা সামর্থ্য দেখছি, যাকে বলে, তিনটি বছর সময় লাগবে।

বাসুদেব বললে—তুই খেপেছিস! এ-সব সাফ করবার জন্য ওঁর ঐ মালীর কোনো তোয়াক্কা রাখবো?···দেশের বাড়ীতে অত বড় বাগান নিজের হাতে তৈরী করেছি আর এখানকার এই এতটুকু বাগান···এ-হাতে সাফ করতে পারবো না? কি বলিস্?

মধু তখনি জবাব দিলে—খু—ব···খু—ব।

তারপর কলকাতার কলেজে বাসুদেব হলো ভর্ত্তি। প্রত্যহ সকালে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক; তারপর স্নানাহার করে বেলা নটার

বাসে চড়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্যামবাজার…এবং শ্যামবাজার থেকে কলেজ। কলেজ থেকে ফেরা হয় প্রায় পাঁচটায়। ফিরে জলখাবার… তারপর সন্ধ্যায় আসন পেতে বসে যথারীতি সন্ধ্যাহ্নিক। ছুটীর দিনে গঙ্গাস্নান…মন্দিরে কালীদর্শন…বাঁধা রুটিনে নিত্যকর্ম্ম। কলেজের পর গভীর ক্লান্তি—সে ক্লান্তি নিয়ে সহরে কোথায় যাবে? কি বা দেখবে? অবসর কৈ? বন্ধুবান্ধব মেলা কঠিন। ক্লাশে প্রায় দেড়শো ছেলে—সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। তাদের সৌখীন চাল…কত রকমের খেয়াল রুচি আর সখ! সে এসেছে সুদূর গ্রাম থেকে—নিঃসঙ্গ থাকলেও সেখানকার খাতির যত্ন আদর, এবং যে আবহাওয়ায় সে এত-বড় হয়েছে! তার উপর এখানকার এই দলের সঙ্গে তার কোথাও যেন মিল নেই—না বেশে-ভূষায়, না আচারে-রীতিতে! জলের মাছকে ডাঙ্গায় তুললে তার যেমন হাল হয়, বাসুদেবের ভাব অনেকটা সেই রকম! অর্থাৎ ফিশ্ আউট অফ ওয়াটার!

বাড়ীতে হামেশা চিঠি লিখতে হয়। বাসুদেব বাপকে লেখে… এখানকার রিপোর্ট—ফিরিস্তির প্রত্যেকটি বিধি-নিষেধ সে মেনে চলছে! লেখে, অনার্য্য পানভোজনে বিরত আছে; কলেজে যাতায়াত ছাড়া কলকাতা সহরের সঙ্গে কোনো রকম সম্পর্ক রাখে না।

চিঠি পড়ে মথুরামোহন আশ্বস্ত হন। বাসু এখান থেকে চলে যাওয়া ইস্তক তার অভাব মনখানাকে মাঝে মাঝে কেমন শূন্যতায় ভরিয়ে তোলে। মথুরামোহনের মনে হয়, তিনি যেন অত্যন্ত নিঃসহায়! অবলম্বন করবার মতো কিছুই তিনি আঁকড়ে পান না! বাসুর চিঠি সে শূন্যতা কতক পূর্ণ করে তোলে। তাই তিনি বাসুকে লেখেন; —রোজ আমাকে চিঠি লিখবে…একখানি পোষ্টকার্ড অন্ততঃ। তোমার

জন্য আমার মন সব সময়ে উৎকন্ঠিত আছে। কখনো একা আমাকে ছেড়ে থাকোনি তুমি ইত্যাদি।

চিঠি পড়ে চিঠি শুনে বাচস্পতি কর্ত্তাকে বলেন—দেখেছেন! বলেছি তো, আপনার ছেলে…আপনার সনাতন শাসনে মানুষ হয়েছে… আপনার সনাতন আদর্শ নিষ্ঠা…ও ছেলে লঙ্ঘন করতে পারে কখনো!

নিশ্বাস ফেলে মথুরামোহন বলেন—হুঁ!…তারপর বাচস্পতির দিকে তাকিয়ে বললেন—হ্যাঁ, পড়ো।

বাচস্পতি আবার পড়তে সুরু করেন পুরাণের আখ্যান।

৫

সেদিন রবিবার…কলেজ নেই। সকালে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে রঘুর হাতের নারকোল নাড়ু খেয়ে…দুধ তখনো জ্বাল্ হয়নি…বাসুদেব এলো নীচে…বাগানে। চারিধারে চেয়ে চেয়ে দেখছে। হঠাৎ নজরে পড়লো, পথের দিকে বেড়ার ধারে বাগানে কতকগুলো খেজুর ঝোপ…সেই ঝোপের ধারে বসে হাড়-জিরজির সেই বুড়ো রোগা মালী ধুঁকছে। তার সামনে কোদাল আর ঝোড়া। দেখে তার কেমন মমতা হলো! আস্তে আস্তে সে এলো সেই বুড়ো মালীর সামনে। দেখে, মালী হাঁফাচ্ছে! বাসু বললে—কি রে, তোর দম যে বেরিয়ে গেছে, দেখছি!

বাসুকে দেখে মালী যেন কেঁপে উঠলো! কাজ না করে বসে আছে…কাজে ফাঁকি…এখনি হয়তো দূর করে দেবেন! না হয় রোজ কাটা যাবে! অত্যন্ত অপ্রতিভ ভাবে বাসুর পানে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে সে বললে—আজ্ঞে…

বলে ওঠবার চেষ্টা! তাকে নিরস্ত করে বাসু বললে—বুড়ো মানুষ··· তোর এ হাড়ে কী সামর্থ্য! তুই যা, ওই দালানে গিয়ে জিরো'গে।

মালীর মুখ বিবর্ণ। মালী বললে—আজ্ঞে···

বাসু তখন মালকোঁচা আঁটছে···মালকোঁচা এঁটে মালীর কোদাল-খানা নিলে হাতে। মালীর প্রাণটা যেন বেরিয়ে যাবে! সে উঠে কোদাল নেবার জন্ম হাত বাড়ালো, বললে—বাবু···

বাসু বললে,—ঠিক আছে। বললুম, তুই যা, জিরো'গে।

মালীর ন যযৌ ন তস্থৌ ভাব! মুখে কথা সরে না। বাবুর পানে সভয় নেত্রে চেয়ে আছে! বাসু বললে—তুই যা। আমার সখ হয়েছে, তোর কোদাল নিয়ে আমি একটু···

কথাটা বলে বাসু কোদাল হাতে এগিয়ে চললো বেড়ার কাছে। এখানটায় আগাছার ঝোপ বেশ ঘন। মালী ভয়ে ভয়ে তার পিছনে এলো এগিয়ে। দেখে বাসু বললে—এটর্ণিবাবুর যা কাণ্ড! তোর এই দেহ···তোকে হাসপাতালে না পাঠিয়ে এখানে পাঠিয়েছেন মালীর কাজ করতে!

মালী আবার বললে—আজ্ঞে···অতি করুণ তার কণ্ঠ। তাকে আশ্বাস দিয়ে বাসু বললে—তোর ভয় নেই, তোর চাকরি যাবে না··· রোজ কাটবো না···তুই যা, খানিক জিরিয়ে নে।

মালী কি করে? বাবুর বার-বার এই এক কথা! সে নিঃশব্দে ধীর পায়ে বিদায় নিলে।

এ কাজে বাসুর যেমন অভ্যাস, তেমনি নৈপুণ্য। গায়ে ফতুয়া··· মালকোঁচা আঁটা · কোদাল হাতে আগাছা সাফ করতে লেগে গেল।

সামনে ঘাটের পথ···সে পথে কত রকমের লোক চলেছে···স্ত্রী, পুরুষ, ছেলেমেয়ে···কেউ চলেছে স্নান করতে, কেউ স্নান করে ফিরছে!

কেউ চলেছে কোনো ধান্দায়। বাসুর কোনোদিকে লক্ষ্য নেই—সে নিজের মনে জঙ্গল সাফ করছে এবং কেটে এক-ডাঁই জমে উঠলে মালীর সেই ঝোড়ায় তুলে ফটকের বাইরে এনে পথে ফেলছে।

নানা লোকের মতো পথে চলেছিলেন এক বর্ষীয়সী মহিলা… তাঁর সঙ্গে তাঁর অষ্টাদশী কন্যা। গঙ্গায় স্নান সেরে দুজনে বাড়ী ফিরছেন। বাসুর বাড়ীর কাছাকাছি এসে মহিলা থমকে দাঁড়ালেন…মেয়ে আসছিল তাঁর পিছনে। মেয়েকে উদ্দেশ করে মা বললেন—একটু দাঁড়াবে, ওখানে বেশ তালশাঁস বিক্রী হচ্ছে, তোদের জন্য কিছু নিই। উনিও খেতে ভালোবাসেন।

মায়ের কথায় মেয়ে দাঁড়ালো। মা গেলেন…পথের ধারে বসে একজন লোক কলাপাতায় সাজিয়ে তালশাঁস বিক্রী করছে, তার কাছে। মেয়ের হাতে ভিজে কাপড়-চোপড়…সে দাঁড়িয়ে মায়ের পানে চেয়ে…বাসু কাটা আগাছা-বোঝাই ঝোড়া মাথায় ফটকের বাইরে পা দিয়ে কোনোদিকে না চেয়ে ঝপাৎ করে পথের কিনারায় জঞ্জাল ফেললো… সে শব্দে চমকে মেয়েটি ফিরে তাকালো…জঞ্জালগুলো পড়েছে তার কাছ থেকে হাত দুয়েক দূরে।

মেয়েটির দু'চোখে ঝাঁজ…চোখ রাঙিয়ে বাসুর পানে চেয়ে সে তুললো ঝঙ্কার,—কী রকম ধাঙড় তুই! কাণা! মানুষের গায়ে জঞ্জাল ফেলিস্!

বাসু দেখে, তাই তো, না দেখে…অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে মিনতি-ভরা কণ্ঠে সে বললে—আজ্ঞে, আমি দেখতে পাইনি।

মেয়েটি ভেঙচে উঠলো। বললে,—দেখতে পাইনি! কাণা!

এ কথার জবাব নেই। নিরুপায় অপ্রতিভভাবে বাসু ফিরলো বাগানে। মেয়েটি তখনো বাসুর পানে চেয়ে আছে…তার চোখের

আগুন তখনো নেবেনি। কলাপাতার ঠোঙায় তালশাঁস নিয়ে মা এলেন মেয়ের কাছে। বললেন—বেশ কচি কচি রে···চল এবার।

সঙ্গে সঙ্গে মায়ের দৃষ্টি পড়লো, বেড়ার ওধারে বাগানে কোদাল হাতে বাসু জঙ্গল কাটছে, তার উপর! মাথায় ঘন চুল—সে চুলের ছাঁটকাট সম্পূর্ণ গ্রাম্যভাবের···গায়ে ফতুয়া, তাও ধূলায় কাদায় ভরে আছে, আধময়লা ধুতি মালকোঁচা করে পরা। দেখে মা বলে উঠলেন—এই তো রে! আমরা খুঁজে ধাঙড় পাই না।···এই তো দেখছি—এদের বাগানে ধাঙড় কাজ করছে।

মেয়ে বললে—ধাঙড় নয় মা, বাবুদের বাগানের মালী।

ভ্রূ-ভঙ্গী করে মা বললেন—তোর যেমন কথা! বলে, এ বাড়ী-বাগান চিরকাল খালি পড়ে আছে···যার বাড়ী, কাকেও সে ভাড়া দেবে না··· আজ হঠাৎ সে-বাগানে মালী এলো কাজ করতে! দাঁড়া, একবার দেখি, আমাদের ওখানে যদি···এ কথা বলে বাসুকে উদ্দেশ করে মা ডাকলেন—শুনছিস? ওরে, ও বাছা···

একটু আগেই জঞ্জাল ফেলতে গিয়ে ছোট্ট যে ঘটনাটুকু হয়ে গেছে, সেই কথা বাসুর মাথায় তখনো মৌমাছির মতো গুনগুন করছে··· মেয়েটির উদ্দেশে তার দু'কান খাড়া করেই সে আগাছা কোপাচ্ছে··· মায়ের কথা কানে পৌছুলো এবং সেই কণ্ঠ লক্ষ্য করে সে তাকালো মায়ের দিকে। দেখলো, সেই মেয়েটি এবং তার পাশে বর্ষীয়সী মহিলা ···তার পানে চেয়ে।

সদ্যকৃত অপরাধ স্মরণ করে বেশ একটু কুণ্ঠিত স্বরে বাসু বললে—আজ্ঞে, আ-আ-মা-কে বলছেন?

বাসুর চোখ পড়লো মেয়েটির চোখে···ও-চোখে তখনো অগ্নির কণা! চোখোচোখি হতে মেয়েটি একটু রূঢ় কণ্ঠেই বললে—হ্যাঁ।

বাসুর মাথায় রক্ত ছলাৎ করে উঠলো! হাসু ভাবলো, তারই জের···

মেয়েটি বলে উঠলো—আমাদের বাড়ী কাজ করবি?

বাসু হতভম্ব! অজ্ঞাতেই অনুচ্চ কণ্ঠে তার মুখে কথা ফুটলো—কাজ?

মেয়েটি বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাজ।

কোনোমতে বাসু বললে···তার মাথায় একরাশ বোল্‌তার গুন্‌-গুনানি! বাসু বললে—কি কাজ?

মেয়েটি বললে—কী আবার? এখানে যে কাজ করছিস্‌··· জঙ্গল সাফ।

বাসু বিস্ময়ে একেবারে হতবাক। এঁরা কি ভেবেছেন তাকে? ধাঙড়?···আশ্চর্য্য!

বাসুকে নিরুত্তর দেখে মা বললেন—হ্যাঁ রে, আমাদের বাড়ীর উঠোনটা আগাছায় ভরে ভয়ানক জঙ্গল হয়ে আছে। একদিন একটা সাপ বেরিয়েছিল। ধাঙড় পাই না খুঁজে।···আমাদের বাড়ী এই কাছেই, আস্‌বি বাবা?

বাসু একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে···কথাটা সু-স্পষ্ট শুনলো। কিন্তু কি জবাব দেবে? সে নির্বাক।

মেয়েটি বললে—অমনি নয়, পয়সা দেবো।

বিস্ময়ের তরঙ্গ-দোলা! সে দোলায় বাসু দুলছে!

মা বললেন—কী রে, পার্‌বি নে?

বিস্ময়ের তরঙ্গে ফুটলো কৌতূহল···সেই সঙ্গে কৌতুক রহস্যে তরুণ মনের লোলুপ আগ্রহ! বাসু বললে—কেন পারবো না? এই তো আমার কাজ।

মেয়েটি বললে—কত নিবি?

বিভীষিকা ঘুচে বাসুর মনে মেয়েটিকে কেন্দ্র করে এক অপূর্ব্ব ভাব! মৃদু হেসে বাসু বললে—আজ্ঞে, কত কাজ···না দেখে কি করে বলবো?

মা বললেন—সে তো ঠিক।···তা···তা'হলে এখন একবার আসবি বাছা? আমার লোকজন নেই···কে ডাকতে আসবে? তাই এখন আমাদের সঙ্গে এসে দেখে···

রহস্য এবং কৌতুক বাসুর মনকে রীতিমত লোলুপ করে তুলেছে! বাসু বললে—আজ্ঞে, হ্যাঁ, চলুন!

মা বললেন—তাহলে আয় বাছা।

কথাটা বলে মেয়েকে নিয়ে মা চলতে সুরু করলেন। বাসু এলো সঙ্গে। আগ্রহের আতিশয্যে কোদালখানা রেখে আসবার কথা বাসুর মনে জাগলো না।

অনেকখানি এগিয়ে এই পথের উপরে জীর্ণ একখানা বাড়ী—পাঁচিলে ঘেরা। পাঁচিলের ইট মাঝে মাঝে খশে গেছে—সদরের কাঠ বিবর্ণ মলিন। মেয়েকে নিয়ে মা ঢুকলেন বাড়ীতে···পিছনে কোদাল হাতে বাসুদেব।

ঢুকে সামনে উঠোন—ছোট নয়···আগাছায় ভরে ঘন জঙ্গল হয়ে আছে। উঠোনের কোলে টানা রোয়াক—সেই রোয়াকের কোলে পাশাপাশি দু'খানা ঘর। দেওয়ালে কবে সেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে যেন বালি লাগিয়ে চূনকাম করা হয়েছিল! কালের চক্রে সে চূণ বালি গেছে খশে—দেওয়ালের খানিকটা লোণা-ধরা···খানিকটা সবুজ শ্যাওলা আর খানিকটা যেন ঝুলের মতো কালো। উঠোনের একদিকে ছোট একখানি তক্তাপোষ—তক্তাপোষের উপর পাতা জীর্ণ সতরঞ্চি। সেই সতরঞ্চিতে বসে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক নিবিষ্ট মনে খাতায় কি

লিখছেন···একাগ্র মনে তন্ময় হয়ে লিখছেন। তাঁর সামনে ময়লা ছেঁড়া ছ'পেনি দামের চটি কখানা ইংরাজী বই।

বাড়ী ঢুকে ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে মেয়েটি বললে—তুমি এখনো বসে লিখছো বাবা! সকালেই বেরুবে, বলেছিলে।

খাতার পাতা থেকে চোখ না তুলেই বাপ দিলেন জবাব—হ্যাঁ মা··· নভেলখানা শেষ করতে পারিনি। আর এই কটা পাতা লিখলে শেষ হয়। তাই লিখে শেষ করেই বেরুবো।

শুনে মা বললেন—তাহলে দুটি খেয়ে নিয়েই বেরিয়ো! না হলে বড্ড বেলা হবে।

বাপ বললেন—কিন্তু···

বাধা দিয়ে মা বললেন—না, না, কিন্তু নয়···আমি এখনি ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি। দুটো আলু ভাতে দেবো···সেই সঙ্গে একটু ডাল আর কিছু ভাজাভুজি।

বাপ এবার খাতা থেকে মাথা তুললেন। বললেন—বেশ, তাহলে সেই ব্যবস্থাই করো। বইখানা এর মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।···কশাইটোলার পাকড়াশি পাবলিশার কথা দেছে, লেখাটা শেষ করে দিলেই তারা আশি টাকা দিয়ে এর কপিরাইট কিনে নেবে···তাহলে ঐ টাকাটা নিয়ে অমনি একবার বিরিঞ্চি গোঁসাইয়ের কাছে যাবো সেই নিমতলায়। গিয়ে তাকে কিস্তির জন্য ওই টাকাটা দিয়ে আর একমাস সময়···

মার কপালে চিন্তার রেখা···মা বললেন—হ্যাঁ, সেও তো আবার শিরে সংক্রান্তি! নিলেমের দিনও তো এগিয়ে এলো।

নিশ্বাস ফেলে বাপ বললেন—হুঁ।

বাপ অসহায়ের মতো চারিদিকে তাকালেন···বাসুদেবকে দেখে বললেন—এ?

মা দিলেন জবাব—হ্যাঁ···উঠোনটা যা হয়ে আছে···কোন্‌দিন সাপে ছোবল দেবে! এই বর্ষাকাল। তা কোনোখানে একটা ধাঙড় দেখতে পাই না···চান করে আসবার সময় পথে এ ছেলেটিকে পেলুম—ডেকে আনলুম।

বাপ বললেন—ও, তা বেশ করেছো।

এ-কথা বলে বাপ খাতার পাতায় মনঃসংযোগ করলেন।

বাসু কথাগুলো শুনলো। আভাসে এ পরিবারের যেটুকু পরিচয় মিললো, বুঝলো, সংসারে মানুষ আছে···সুখ নেই অথচ চমৎকার শান্তি।

তাকে উদ্দেশ করে মা বললেন—ত্যাখ্‌ বাবা, কি হয়ে আছে। পারবি এ জঙ্গল সাফ করতে?

একটা উদ্যত নিশ্বাস···সে নিশ্বাস চেপে বাসু বললে—কেন পারবো না, মা?

মা বললেন—কত নিবি?

বাসুর কণ্ঠে দ্বিধা···কোনোমতে সে বললে—আজ্ঞে, আপনিই বলুন, মা।

মেয়ে বলে উঠলো—দু'আনা পাবি।

ফশ্‌ করে বাসুর মুখ থেকে জবাব বেরুলো—দু'আনা!

মা বললেন—সব কাজের জন্য দু'আনা নয়, দু'আনা করে রোজ আর সেই সঙ্গে জলপানি!···বাসু নিরুত্তর।

মা বললেন—মনে কর, এ যেন ফালতু কাজ করছিস···ফাউ! বাবুদের বাড়ী কাজ করছিস তো—সে কাজের ফাঁকে-ফাঁকে একটু যেমন অবসর পাবি, সেই অবসরে! আমার তাড়া নেই বাছা···গরীবের একটা কাজ না হয় একটু শস্তা করেই···

মায়ের এ-কথায় কেমন একটু করুণ মিনতি···বাসুর যে বয়স, সে বয়সে এ মিনতিতে মানুষ নিজের যতখানি পারে, দান করে অপরকে আরাম দিতে ব্যাকুল হয়!

বাসু বললে—করবো মা। আপনার যা খুশী হয়, দেবেন।

বাসুর কথায় মা খুশী হলেন···মেয়ের মনও ধাঙড়ের উপর প্রসন্ন হলো।

মা বললেন—কখন থেকে তাহলে?

বাসুর মনে কৌতূহল। সোৎসাহে সে বললে—আজ্ঞে, বলেন যদি, এখনি···

মেয়েটি বললে—কিন্তু বাবুদের বাড়ীর কাজ ফেলে?

বাসু বললে—ও ঠিক আছে। ওখানে ফুরনের কাজ··ও তো আছেই। কিন্তু···এখানে যা দেখছি, দুচার দিনের কাজ নয়।

মা বললেন—সে তো দেখছি বাবা। বর্ষাকাল বলেই আমার ভাবনা। আস্তে-আস্তে সাফ হলে বাঁচবো। বললুম তো, একদিন সাপ বেরিয়েছিল।

বাসু বললে—বেরুবেই তো! এ যা হয়ে আছে, সাপেরা দল বেঁধে থাকবার মতো এমন জায়গা আর কোথায় পাবে? মা-মনসার ঘাঁটী!

মাকে উদ্দেশ করে মেয়ে বললে—আগে এই যাওয়া-আসার পথ থেকে কাজ সুরু করুক মা! এ কথা বলে বাসুর দিকে চেয়ে মেয়েটি বললে—কিন্তু শোন্ খুব সাবধান, এই কুমড়ো গাছগুলো বাঁচিয়ে কাটবি··· আর ঐ তুলসীর ঝাড়···ওগুলো যেন কেটে ফেলিসনে।

চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করে বাসু দেখলো···দেখে বললে—না, না, ও-সব দরকারি গাছপালা···ওগুলো কাটবো কেন?

মা দিলেন মেয়েকে তাড়া—তাহলে আর দেরী নয় রে, কাপড়গুলো

শুকোতে দিয়ে চট্‌ করে তুই চালগুলো ধুয়ে দে মা। আমি ততক্ষণ উনুনটা ধরিয়ে ফেলি।...এ-কথা বলে মা ঢুকলেন ঘরে।

কোদাল হাতে বাসু তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে—মেয়েটি দেখলো...দেখে বললে—হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস্ যে! নে, কাজ সুরু করে দে...যেমন বললুম।

—হ্যাঁ। বলে বাসু ধরলো কোদাল। রোয়াকের নীচে দুটো খুঁটিতে দড়ি বাঁধা—মেয়ে নামলো উঠোনে সেই দড়িতে ভিজে কাপড় খাটিয়ে দিতে। সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠে মৃদু-গুঞ্জনে গানের কলি—

ফুলে ফুলে ঢোলে ঢোলে বহে কিবা মৃদু বায়...

বাসু কাজ করছে...তার কানে এই সুরের কূজন! ভদ্রঘরের এ-বয়সের মেয়ের গলায় গান...সে এই প্রথম শুনলো। চমৎকার!

বাপ একমনে লিখছেন আর লিখছেন—মাঝে মাঝে পাশে জড়ো করা ইংরেজী বইয়ের ভিতর থেকে দু'একখানা টেনে টেনে কী দেখছেন, পাতা উল্টোচ্ছেন...তারপর বই নামিয়ে আবার লেখা।

বাসু কাজ করতে করতে এও দেখছে। তার মনে কৌতূহল... উনি কি লিখছেন? অতগুলো বই...দেখে মনে হচ্ছে, স্কুলের পড়ার বই নয়! কাজেই উনি অর্থ-পুস্তক লিখছেন না! তবে? বরাবর গাঁয়ে থাকে...দুচারখানা নভেল যা পড়েছে, তা এই ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর খুব লুকিয়ে...বইয়ের আলমারি থেকে নিঃশব্দে বার করে এনে। পড়েছে বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর...পড়েছে বিষবৃক্ষ, আর বাঁধানো বঙ্গদর্শন-এ কতকগুলো কবিতা। সে সবের মধ্যে মনে আছে চন্দ্রশেখর-এ প্রতাপ শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের কথা...দুজনের আকাশে নক্ষত্র গোণা... নদীতে সাঁতার আর দলনী বেগমের কথা। ইস্কুলের ইতিহাসের পাতায়

যে নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে পরিচয়, তাকে কোনোকালে মানুষ মনে হয় নি! ভাবতো, আর পাঁচটা নবাবের মতো একজন নবাব···ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গেছে! মানুষের মতো নবাবের ঘরে বৌ-বেগম থাকে··· মশনদ ছেড়ে বৌ-বেগমের সঙ্গে নবাব কথা কয়, গানবাজনা শোনে··· এ ছিল তার স্বপ্নের অগোচর! চন্দ্রশেখর-এ মীরকাশিমের সঙ্গে পরিচয় হয়ে অনেকখানি আরাম পেয়েছিল এই ভেবে যে আর-পাঁচজনের মতো নবাবও মানুষ! মশনদে বসে রাজ্যপাট করা, একে-তাকে শূলে দেওয়া আর যুদ্ধ করা ছাড়া নবাবের ঘর-সংসার আছে, বৌ আছে! কলকাতার কলেজে পড়তে এসে জীবনে এতটুকু বৈচিত্র্য পায় নি। কলেজে যাওয়া আসা···কলেজে ছেলের ভিড়···পথে-ঘাটে গাড়ী-ঘোড়া, লোকজনের হৈ-হৈ কলরব। বাড়ী আসতে আসতে সন্ধ্যা নামে, আলো জ্বেলে কলেজের কেতাব খুলে বসে। তারপর সকালে উঠে আবার চটপট্ করে কলেজে যাবার আয়োজন। এ বাড়ীতে এসে তার এখন মনে হচ্ছে, এ যেন আর এক পৃথিবী!

মেয়েটির কাপড় শুকোতে দেওয়ার কাজ শেষ হলো। বাপের দিকে চেয়ে মেয়ে বললে—তোমার আর কত দেরী, বাবা?

মাথা না তুলে বাপ জবাব দিলেন—আর দু'তিনখানা পাতা—তাহলেই নভেলটা শেষ হয়।

ভিতর থেকে মায়ের আহ্বান—ওরে চাঁপা, তোর হলো? চালগুলো শীগ্‌গির ধুয়ে দে মা!

—হ্যাঁ মা, আমি আসছি। এ-কথা বলে মেয়ে ঘরে ঢুকলো।

কোদাল রেখে বাসু দাঁড়ালো···তার কেমন চমক লাগলো! ইনি তাহলে নভেল লিখছেন! বাঃ!···আর ঐ মেয়েটির নাম···চাঁপা! মনে হলো, নামটি খাশা মানিয়েছে! এর রঙ ঠিক চাঁপার মতো না হলেও

গাছের সদ্য-ফোটা চাঁপাফুল যেমন দেখতে ভালো লাগে, দেখে মন খুশী হয়, এ মেয়েটিকে দেখলেও মন তেমনি···বাসুর বুকের মধ্যে ছোট একটু নিশ্বাস।

চাঁপা তখনি এলো বেরিয়ে···তার হাতে পিতলের সরায় চাল। বাসুকে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চাঁপা বললে—দাঁড়িয়ে আছিস যে! হাঁ করে কি দেখছিস?

অপ্রতিভের মতো বাসু বললে—আজ্ঞে, না!

ধমক দিয়ে চাঁপা বললে—আজ্ঞে, না কি?

মেয়ের ধমক শুনে বাপ ফিরে তাকালেন বাসুর দিকে। তাঁর যেন হুঁশ হলো! তিনি বললেন—কি হয়েছে?

বাসু এতক্ষণে এক-ডাঁইকেটে জড়ো করেছে! চট্ করে মাথায় জবাব জোগালো। সে বললে—আজ্ঞে, একটা ঝুড়ি···এগুলো ফেলে আসবো।

দেখে বাপ বললেন—ও, হ্যাঁ। ওমা চাঁপা, ওকে একটা ঝুড়ি দে।

—দিচ্ছি। বলে চাঁপা গেল ভিতরে।

বাসুকে বাবা বললেন—আগে এ-সব আগাছা সাফ হোক, তারপর জানো, আমার একটু ফুলগাছের সখ আছে···কতকগুলো মল্লিকা আর বেল ফুলের গাছ···

মহা-উৎসাহে বাসু বললে—আজ্ঞে, আমি আপনাকে খুব ভালো ভালো চারা এনে দেবো'খন। সে সব চারায় ফুল হবে এই এত-বড়··· আর কী গন্ধ!

চাঁপা একটা ঝুড়ি নিয়ে এলো। কতকালের জীর্ণ ঝুড়ি। বাসুর দিকে ঝুড়িটা ছুঁড়ে দিয়ে চাঁপা বললে—এই নে। তারপর বাপের দিকে চেয়ে চাঁপা বললে—তোমার হয়েছে?···বাপ বললেন—হ্যাঁ মা, আমি এবার নেয়ে নেবো, তুমি আমার এই সব খাতাপত্র···

বাপের মুখের কথা লুফে নিয়ে চাঁপা বললে—হ্যাঁ, সব গুছিয়ে··· এইটুকু বলার পরই তার নজর পড়লো বাসুর দিকে। ঝুড়ি হাতে বাসু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁপা ধমক দিলে—ঝুড়ি পেয়েছিস তো—তবে ওরকম কেষ্ট-ঠাকুরের মতো দাঁড়িয়ে··· .

কণ্ঠে মৃদু সঙ্কোচ···বাসু বললে—আজ্ঞে, এ ঝুড়িতে···বলে সে ঝুড়িটা তুলে দেখালো। ঝুড়ির তলাটা ফাঁশা। ঝুড়ি দেখিয়ে বাসু বললে—এ ঝুড়িতে কি করে···

বাপ হাসলেন; মেয়ের পানে চেয়ে বললেন—সত্যি তো চাঁপা, ঝুড়ির তলায় কিছু নেই···

বাপের এ হাসি চাঁপার গায়ে যেন আগুন ছিটিয়ে দিলে! বাসুর দিকে চেয়ে সে তুললো ঝঙ্কার—বোকার ধাড়ি! কোণে ঐ কচুর ঝোপ···ও থেকে দুখানা কচুপাতা ছিঁড়ে ঝুড়ির তলায় বিছিয়ে দিবি, এটুকু বুদ্ধি ঘটে নেই? কোথাকার ধাওড় তুই!

অপ্রতিভের মতো বাসু তাকালো বাগানের কোণে। সেখানে কচুর ঝোপ। দেখে বাসু বললে—আজ্ঞে, ওই কচু! হুঁ! ঠিক বলেছেন!

বলে সে কচুর ঝোপের দিকে এগুলো।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে দরদ-ভরা কণ্ঠে বাপ বললেন—বকিস্‌নে রে, ছেলেমানুষ···পেটের দায়ে নতুন একাজে লেগেছে হয়তো।

বাপের দিকে ফিরে মৃদু ভর্ৎসনার সুরে চাঁপা বললে—তুমি আর নাই দিয়ো না, বাবা। নাই পেলে এসব লোক মাথায় চড়ে বসে।

বাসুর বাড়ীতে ওদিকে গণ্ডগোল। মধু দুধ জ্বাল দিয়ে দুধের বাটি হাতে এঘর ওঘর, ছাদ বারান্দা বাগান পুকুরধার ঘুরে বেড়াচ্ছে···

দাদাবাবু দুধ খাবেন···নিত্যকার বাঁধা রুটিন···দাদাবাবুর দেখা নেই! গেল কোথায়? রঘুঠাকুর তাড়া দিচ্ছে মধুকে—নটা বেজে গেছে—বাজারে যাবি কখন? রান্নাবান্না···

রঘুকে ধমক দিয়ে মধু বললে—আরে রোসো, দাদাবাবু গেল কোথায়···পাত্তা পাচ্ছিনে! ঠিক এই সময়ে সেই বুড়ো মালী এসে মধুকে ডাকলো—ই মধু বাই···

মধু খ্যাঁক করে উঠলো—কী···তোর আবার কি?

বুড়ো মালী বললে—মু-অ কু-দর খণ্ড।

মধু বললে—তোর কুদরখণ্ড···তার আমি কি জানি?

মালী বললে—হঃ···বাবু মু-অ কুদরখণ্ড নেইকিরি···

মধুর ভ্রূ-কুঞ্চিত হলো। সে বললে—বাবু তোর কুদরখণ্ড নেইকিরি···

মালী বললে—হঃ।

মধু অবাক! সে তাকালো রঘুর দিকে। বললে—নাও, বাবুর পাত্তা পাচ্ছিনে···এর কুদরখণ্ড নিয়ে···আচ্ছা মানুষ···এই সকালে গেল কোথায় বলো দিকিনি?

৬

বাসু এক-মনে কোদাল হাতে আগাছার জঙ্গল কাটছে···কাটছে···কাটছে। সকালের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার মনে কল্পনার কত ছবিই না ফুটছে! নিজের বাড়ীর গণ্ডীটুকু ছাড়া বাহিরের জগতের সঙ্গে এ-বয়সে কতটুকু তার পরিচয়। মা মারা গেছেন কবে সেই এতটুকু বয়সে! জমিদারের বাড়ী···চাকর-বাকরের হাতে লালন···মায়ের স্নেহের

কথা মনে পড়ে না! মনে পড়ে শুধু মায়ের মুখ! জীবনের পালা শেষ করে মা যখন চলে গেলেন···বিছানায় তাঁর দেহখানা পড়ে আছে··· বাড়ীতে কান্নার রোল···কে একজন দাসী না, চাকর তার খেলা থেকে তাকে ধরে এনে মায়ের সেই বিছানার সামনে চকিতের জন্য বসিয়ে দিয়েছিল! তারপর কি হলো, জানে না! শুধু সেদিনের পর থেকে মাকে আর বাড়ীর কোথাও দেখেনি! খোঁজ করে দেখা—পাঁচজনের কোলে-পিঠে ঘুরতে ঘুরতে খোঁজ নেবার ফুরসৎ মেলে নি। তারপর পড়া আর খেলা···খেলা আর পড়া···মাষ্টার-মশায়, বাবা, দিদি, বাচস্পতিদা, বটা, মধু! তারপর দিদির হলো বিয়ে! বাজনা-বাদ্যি, খাওয়া-দাওয়া, লোকজনের ভিড়ে বাড়ী গিস্‌গিস্ করে উঠলো! দিদি চলে গেল বাড়ী থেকে। আগে মাঝে মাঝে আসতো···এখন তিন চার বছর থেকে কালে-ভদ্রে···বছরে হয়তো একবার! ভগ্নীপতি কিরণদা আসে সঙ্গে···বড় জোর পাঁচদিন, কি সাতদিন, কি দশদিন থাকে। মানুষের সঙ্গ কতটুকু পায়!···এখানে এসে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে···ক্লাশে অত ছেলে···কারো সঙ্গে তেমন মিশ খেতে পারে নি। অনেকে তাকে তামাসা করে—গেঁয়ো···মাথার চুলগুলো জঙলীর মতো···তার উপর আবার টিকি! পোষাক-আশাক সেকেলেপানা। ক্লাশের আর সকলের মাথার চুল বারো-আনা চার-আনা ছাঁদে ছাঁটা···টিকির টি-ও নেই। মুখে গোঁফের রেখা উঠেছে, কি, না উঠেছে···দেড়শো জনের মধ্যে একশো-পঁচিশজন কী রকম সিগারেট খায়···পান···জর্দ্দা! তাদের মুখে কত-রকমের কথা—সিনেমার কথাতেই সকলে মশগুল। কলেজে লেকচারের সময় বিড়বিড় করে তাদের কথা চলে···সিনেমা-ষ্টারদের কথা। আলতালতা, চুমকিবালা, মধুমতী, সারেঙ্গী, তবলাজান···বাসুর কাণে কথাগুলো এসে লাগে। সে ভাবে, এরা যেন কোন রূপকথার পুরীর সন্ধান পেয়েছে···

কলেজে আসে দেহগুলো নিয়ে শুধু পার্সেণ্টেজ রাখতে···মন ঐ সিনেমা-রূপকথার পুরীর পাঁচিলের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

তারপর আজ এখানে···এই ছোট্ট পরিবার···এই জীর্ণ বাড়ী··· বাড়ীর কর্ত্তা নভেল লেখেন···গিন্নী ঘর-সংসার দেখেন···আর ঐ মেয়েটি··· মনে পড়লো কবে একদিন মেঘলা দিনে মিষ-কালো মেঘে আকাশ-পৃথিবী অন্ধকারে ঢেকে একাকার হয়ে গিয়েছিল···বাড়ীতে খোলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাসু চেয়েছিল সেই আঁধার-কালো মেঘভরা আকাশের দিকে···হঠাৎ কড়-কড়-কড়াৎ শব্দ···সঙ্গে সঙ্গে আলোর তীক্ষ্ণ তীব্র ঝলক! আতঙ্কে বাসুর দু'চোখ আপনা থেকে বুজে গেলেও আঁধার মেঘে আলোর ঐ ঝলকটুকু বড্ড ভালো লেগেছিল! সে ঝলকে তার মন রাঙা হয়ে উঠেছিল! আগাছা কাটতে কাটতে এই মেয়েটির কথায় সেই কবে-দেখা বিদ্যুতের কথা মনে পড়লো! মনে হলে, তার মনে নিত্যকার বাঁধা রুটিন যেন তেমনি কালো মেঘ পুঞ্জিত করে তুলেছিল ···মনের সে মেঘে এই মেয়েটি যেন বিদ্যুতের রাঙা আলো ছিটিয়ে দেছে! ওর কথায়, ওর চোখের ভর্ৎসনাভরা দৃষ্টিতে ভয় করে, তবু কেমন ঐ আলোর ঝলক···

হঠাৎ তার চমক ভাঙলো কর্ত্তার কণ্ঠস্বরে। বাসু তখন হাঁফিয়ে উঠেছে···কাঁধ টন্‌টন্ করছে···ঘামে যেন নেয়ে উঠেছে! কোদাল রেখে আড়মোড়া ভেঙ্গে নিজেকে কায়দা করে নিচ্ছে—কর্ত্তা ওদিকে স্নান সেরে —তাঁর হাতে ছোট একটা আয়না···মুখের সামনে সেই আয়না ধরে চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে কর্ত্তা এলেন ঘর থেকে রোয়াকে বেরিয়ে, বাসুকে দেখে তিনি বললেন—একটু জিরিয়ে নে বাবা। একটানা এমন হাত চালাসনে! ছেলেমানুষ!

তাঁর এই দরদের কথায় আরাম পেলেও বাসু একটু কুণ্ঠিত হলো।

এ বয়সে নিজের শক্তি-সামর্থ্যে কেউ ত্রুটির উল্লেখ করলে মনের পৌরুষে আঘাত···অভিমান! সেই অভিমান বাসুকে···বাসু বললে—আজ্ঞে না, কষ্ট নয়! যেগুলো কেটেছি, ফেলে দিয়ে আসবো কিনা···বলেই কচুপাতা-বিছুনো ঝোড়ায় আগাছার জঞ্জাল তুলে ঝোড়া মাথায় সেগুলো সে বাড়ীর বাহিরে ফেলে দিয়ে এলো। এসে দেখে, কর্ত্তা নেই, ঘরে গেছেন। ঘরে মৃদু কলরব। শুনে বাসু বুঝলো, কর্ত্তার আহারের আয়োজন।

তার কেমন মনে হলো, আচ্ছা, কলেজে সকলে গেঁয়ো বলে তামাসা করলেও তার চেহারা সত্যই ধাঙড়ের মতো···যাতে এঁরা তাকে ধাঙড় বলে ধরে নেছেন? একটু মজা লাগলো!··সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল। চারিদিকে সে একবার তাকিয়ে দেখলো। নজরে পড়লো, রোয়াকের উপর ছোট তক্তাপোষে ছোট আর্শিখানা। আর্শি আর চিরুণী তক্তাপোষে রেখে কর্ত্তা খেতে গেছেন। মনে কৌতূহল হলো তীব্র। চোরের মতো সন্তর্পিত পায়ে বাসু উঠলো রোয়াকে ঝুড়ি আর কোদাল রেখে। রোয়াকে উঠে আর্শিখানা হাতে নিয়ে তাতে নিজের মুখখানা খুব ভালো করে দেখা···যেন নিজের মুখে ধাঙড়ের ছোপ্ খুঁজছে! একাগ্র-মনে মুখ দেখছে···বিশ্ব-পৃথিবী ভুলে। হঠাৎ সেই বিদ্যুৎ-বিকাশের ক-ক-কড়াৎ শব্দ! চমকে চোখ তুলে চেয়ে বাসু দেখে, সেই বিদ্যুতের ঝলক···সামনে চাঁপা! তার হাতে একখানা কাঁসিতে মুড়ি-মুড়কি আর নারকোলের কুচি।

চাঁপার কণ্ঠে ঝঙ্কার,—আরে, ভারী আস্পর্দ্ধা দেখছি তোর! বাবুর আর্সি-চিরুণী নিয়ে···

চাঁপার দিকে চেয়ে অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে বাসু দিলে জবাব—আজ্ঞে না, চিরুণী নয়—শুধু এই আর্শি!

বলেই আর্শিখানা সন্তর্পণে তক্তাপোষের উপর রাখলো।

চাঁপা দেখলো—দেখে ভৎ'সনার কণ্ঠে বললে—আর্শি···আর্শি নিয়ে কি করছিলি, শুনি?

কি জবাব দেবে? বাসুর হকচকানো-ভাব। চকিতের জন্য! পরক্ষণেই সে বললে—স্খলিত কণ্ঠ। বাসু বললে—আজ্ঞে, আজ্ঞে··· মানে, ঐ কচু! আপনি ঐ কচুপাতা নিতে বললেন কিনা···তাই মানে···

চাঁপার দু'চোখে ভ্রূকুটি···দৃষ্টি বাসুর মুখে স্থির নিবদ্ধ। চাঁপা বললে—হ্যাঁ, কচুপাতা! তাই···কি?

নিশ্বাস ফেলে বাসু বললে—মানে, ঐ কচুপাতা···যেমন ছিঁড়েছি, অমনি কি যেন একটা···বিছে, না, বোলতা, না, ভীমরুল···মনে হলো, যেন গালের এইখানটায়···বলে বাসু নিজের গালের একটুখানি দু' আঙুলে বেশ করে টিপে ধরলো।

কথাটা চাঁপার বিশ্বাস হলো না। সে ভাবলো, আর্শি-চিরুণী নিয়ে ধাঙড়ের সখ হয়েছিল মাথা আঁচড়াবার, এখন ধরা পড়ে এই মিথ্যা কৈফিয়ৎ! রূঢ় কণ্ঠে শ্লেষভরে চাঁপা বললে—কচুর পাতা! ভীমরুল! বটে! চালাকির আর জায়গা পাস নে!

অত্যন্ত বিনয়ের ভঙ্গীতে বাসু তুললো প্রতিবাদ; বললে—আজ্ঞে না, সত্যি। চালাকি নয়। জ্বালা করছে! য-য—যথার্থ বলছি, ভীমরুল!

শ্লেষের স্বরে চাঁপা বললে—ভীমরুল।

বাসুর তখনো কৈফিয়ৎ—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভীমরুল! ভীমরুলে হুল ফুটিয়েছে।

ঘরের মধ্যে মা···মায়ের কানে কথাটা গিয়ে ঠেকলো—কি রে, কাকে ভীমরুলে কামড়ালো? বলতে বলতে মায়ের রোয়াকে আবির্ভাব। তাঁর দু'চোখে আতঙ্কভরা দৃষ্টি। মাকে দেখে বাসুকে

উদ্দেশ করে চাঁপা বললে—এই একে! বলছে, গালে ভীমরুলে হুল ফুটিয়েছে।

বাসু তখনো দুটো আঙুল দিয়ে গালের একটুখানি টিপে ধরে আছে। মায়ের চোখ হলো এত বড়। অত্যন্ত চিন্তাকুল কণ্ঠে মা বললেন—ওমা, বলিস্ কি রে ছেলে?...তা হুল ফুটে আছে?...না... ভালো কথা নয়।...হুল বার করে ফ্যাল বাবা! না হলে...এই নে চাবি... বলে আঁচল থেকে চাবির রিং খুলে সেটা বাসুর হাতে দেবার উদ্যোগ। মা বললেন—এই চাবির এই দিকটা গালের ঐ জায়গায় এমনি করে চেপে টিপে ধর্, তাহলেই হুল বেরিয়ে আসবে।

কথাটা বলে মা চাবি দিয়ে হুল বার করবার সন্ধানটুকু বাৎলে দিলেন।

বাসু চাবি নিলে না...হঠাৎ দু' আঙুল খুব টিপে টক করে কি যেন পেয়েছে, এমনি ভঙ্গীতে বলে উঠলো—উ-উ-উ! ও!...এই যে...এই... বেরিয়ে গেছে!—আঃ! বলে কি যেন ফেলে দিলে, এমনি অভিনয়।

মায়ের উদ্বেগ তবু যায় না! মা বললেন—ঠিক তো রে? দেখি... মা এলেন বাসুর দিকে এগিয়ে।

বাসু কুণ্ঠিত হলো। বাসু বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক বার করে নিয়েছি। ও আর দেখতে হবে না! হুল বেরিয়ে গেছে।

মা তবু ছাড়তে চান না! উদ্বিগ্ন কণ্ঠে তিনি বললেন—তা যাক! তবু বাছা, ভীমরুলের হুলের বিষ সহজ নয়—এখনি ভয়ানক আউরে উঠবে!...চুণ ..চুণ...তিনি মেয়ের পানে তাকালেন, বললেন—ওমা চাঁপা, খপ্ করে একটু চুণ নিয়ে আয়, বাছা।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে চাঁপা বললে—চুণ?

বাসুও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—চুণ?

মা বললেন—হ্যাঁ, পানে খাবার চুণ।

মায়ের কথায় চাঁপা গেল চুণ আনতে। বাসুর দিকে ফিরে মা বললেন—পান খাবার চুণ রে! ওখানটায় বেশ করে লেপে দিলে বিষের জ্বালা যাবে।···সাবধানে কাজ করিস বাবা, যে-জঙ্গল হয়ে আছে···কত সাপ-খোপ, বিছে···

চাঁপা তখনি ফিরলো—খানিকটা চুণ নিয়ে। চুণটুকু মায়ের হাতে দিয়ে চাঁপা বললে—এই নাও। চুণটুকু নিয়ে মা বললেন বাসুর দিকে চেয়ে—কোন্‌খানে···দেখিয়ে দে···আমি লাগিয়ে দি।

লজ্জায় বাসু এতটুকু! বাসু বললে—আমাকে দিন, আমি লাগাচ্ছি।

চুণ তাকে নিতে হলো। মা বললেন—যেখানটায় কামড়েছে···বেশ পুরু করে···হ্যাঁ, হ্যাঁ···হুলের বিষ ক্ষয় হয়ে যাবে।

উপায় নেই! চুণ নিয়ে বাসু বেশ পুরু করে সে-চুণ নিজের গালে লেপলো। মা নিশ্চিন্ত হলেন, চাঁপার দিকে চেয়ে মা বললেন—ওর খাবার···

তক্তাপোষের উপর মুড়ি মুড়কির কাঁসি রেখে চাঁপা গিয়েছিল ভিতরে চুণ আনতে; কাঁসির দিকে দেখিয়ে চাঁপা বললে—ঐ···

মা বললেন বাসুকে—কাঁসিতে মুড়ি মুড়কি দিয়েছি···খেয়ে নে··· তারপর কাজ করিস।

মুড়ি মুড়কি খেয়ে বাসু আবার কাজে লেগেছে—ভিতরে ঘরের মধ্যে কর্ত্তা বসেছেন খেতে···গৃহিণী এবং কন্যা কাছে। কাজ করতে করতে বাসু এক-একবার ঐ ঘরের পানে তাকাচ্ছে···এদিকে দুটো জানলা খোলা···সেই জানলা দিয়ে ভিতরকার দু-চারটে কথা ভেসে আসছে···সে কথায় স্নেহ আর দরদের আভাস। বাসুর মনে হচ্ছে, এঁদের সঙ্গে···

হঠাৎ বাড়ীর বাহিরে ঝন্‌ঝনে-খন্‌খনে কাঁশরের আওয়াজ—জয়গোপাল-বাবু বাড়ী আছো ?…জয়গোপালবাবু… ?

সে আওয়াজে বাসু সদরের পানে ফিরে তাকালো। ভিতর থেকে কোনো সাড়া জাগলো না।

বাহিরে আবার সেই আওয়াজ—এবার আরো তীক্ষ্ণ এবং তীব্র। বাসু তেমনি চেয়ে আছে বাহিরের দিকে। হঠাৎ ঘরের মধ্যে মৃদু-মর্ম্মরে জাগলো কণ্ঠ…মায়ের কণ্ঠ! কণ্ঠ মৃদু। মা বললেন—ঐ গো, সেই হতভাগা! সঙ্গে সঙ্গে বাপের কণ্ঠ…যেন উদ্বেগে-ভরা। বাপ বললেন—হুঁ…বিরিঞ্চি।…তারপর চুপচাপ।

কথার এই টুকরোগুলো বাসুর মনে বেশ একটু ঢেউ তুললো। সে বুঝলো, বাহিরে যে-লোক এসেছে…

দু'হাতে দরজা ঠেলে বাহিরের লোক ঢুকলো উঠানে—ঢুকেই তার কণ্ঠে—কৈ গো, কোথায় ?…জয়গোপালবাবু…

বাসু দেখে, বেঁটে কালো রোগা…অষ্টাবক্রের মতো ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তি… বাঁ হাতে একটা জীর্ণ ছাতা…ডানহাতে তুলসীর মালা…কপালে নাকে তিলক…পাঁজির পাতায় যে সংক্রান্তি-বামুনের ছবি ছাপা থাকে…বাসুর মনে হলো, সেই পাঁজির পাতায় ছাপা সংক্রান্তির বামুন যেন জীবন্ত দেহে তার সামনে! চেহারা দেখেই মনে হয়, কুঁজড়ো! মনে হয়, এমন লোক ভগবানের হাত ফশ্‌কে দুচারটে মাত্র মর্ত্ত্যে নেমে এসেছে!

ঘরের মধ্যে মৃদু-মর্ম্মরে মায়ের কণ্ঠ—ওমা চাঁপা……বিরিঞ্চি গোঁসাই…বা একবার…

তেমনি চাপা গলাতেই চাঁপা প্রশ্ন করলে—কি বলবো ?

অষ্টাবক্র বামুন হাঁকলো—কি গো জয়গোপালবাবু, সাড়া দাও না গো!

ঘরের মধ্যে বাপের মৃদু কণ্ঠ চাঁপাকে উদ্দেশ করে—বাইরে বসা ; খেয়ে উঠে আমি যাচ্ছি।

চাঁপা এলো বাহিরের রোয়াকে। বাসু তাকালো চাঁপার পানে—মনে হলো, বিদ্যুৎ এমন মলিন হয় !

চাঁপাকে দেখে পাঁজির বামুন বললে—এই যে মা-লক্ষ্মী···হেঁ·· হেঁ··· বাবা বাড়ী আছে ?

সলজ্জ সভয়কণ্ঠে চাঁপা বললে—হ্যাঁ। খেতে বসেছেন। আপনি একটু বসুন।

বিরিঞ্চি হা-হা করে হাসলো···তারপর দুচোখের শ্যেন-দৃষ্টি চাঁপার মুখের উপর নিবদ্ধ রেখে আস্তে আস্তে রোয়াকের উপর বেতের মোড়া ছিল—সেই মোড়ায় এসে বসলো। হাতে কুঁড়োজালি মালা গুণে গুণে বিড়-বিড় করছে, হরেকেষ্ট, হরেকেষ্ট, হরেকেষ্ট, হরেকেষ্ট ! মোড়ায় বসে চাঁপার পানে চেয়ে ফোগ্‌লা দাঁতে হাসি ফুটিয়ে বিরিঞ্চি বললে—খুব সময়ে এসে পড়েছি তো ! হেঁ হেঁ—হরেকেষ্ট, হরেকেষ্ট, হরেকেষ্ট···আমাকে চেনো তো মা লক্ষ্মী ? বিরিঞ্চি গোঁসাই।

বিরিঞ্চির চোখে পলক পড়ে না···চাঁপার উপর থেকে চোখ সরে না ! পাঁচরকম খাবার দেখলে হ্যাঙলা কুকুর যেমন-চোখে সেই খাবারের পানে তাকায়, তেমনি ও···রাগে বাসুর গা চিড়বিড়িয়ে উঠলো ! চাঁপা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—সে যেন কেমন নিশ্চেতন ! বাসু তা লক্ষ্য করলো। মনে হলো, চেঁচিয়ে সে চাঁপাকে বলে—ও লোকটা ···চোখ দিয়ে তোমাকে গিলে খাবে, তুমি দেখছো না—কি চোখে তোমার পানে ও চেয়ে আছে ! তুমি চলে যাও ওর সামনে থেকে। কিন্তু···

চাঁপার পানে অনেকক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে হেসে বিরিঞ্চি

বললে—বাবাকে গিয়ে খবর দাও—বলো গে, বিরিঞ্চি গোঁসাই এসেছেন···হরেকেষ্ট হরেকেষ্ট···

এ-কথায় চাঁপার যেন চেতনা হলো। সে ঘরে ঢুকবে—বিরিঞ্চি তখনো চাঁপার পানে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে···বিরিঞ্চি বলে উঠলো—হ্যাঁ, অমনি এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও দিকিনি। সকাল থেকে টাকার তাগাদায় ঘুরে ঘুরে পিপাসা···টাগ্‌রা জ্বালা করছে···

সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে চাঁপা ঘরের মধ্যে ঢুকলো। বিরিঞ্চি তখনও ওই দিকে চেয়ে আছে। বাসুর মনে হলো, উঠে তার গালে ঠাশ্‌ করে একটা চড় মেরে বসে, বুড়ো হয়ে মরতে চলেছো, ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে তার ডাগর মেয়ের দিকে চাইতে লজ্জা হয় না? বাসুর মনে যেমন অস্বস্তি···তেমনি জ্বালা! কিন্তু···

বাসুর এই অস্বস্তির মাঝখানে কর্ত্তা জয়গোপালবাবু মুখ মুছতে মুছতে রোয়াকে এসে দাঁড়ালেন···অতিথির পানে চেয়ে···মুখে কৃত্রিম হাসি···জয়গোপালবাবু বললেন—এই যে গোঁসাই মশায়!

বিরিঞ্চি তাকালো জয়গোপালের দিকে, বললে—হ্যাঁ, এদিকে এসেছিলুম ক'টা তাগাদায়···ভাবলুম অমনি তোমাকেও একটা ঢুঁ মেরে যাই! তা···হরেকেষ্ট···হরেকেষ্ট···হরেকেষ্ট···ডিক্রীর টাকার কি করলে? আর দুতিন দিন বাদেই তো তারিখ···বাড়ী লাটে উঠচে।

জয়গোপাল খুব বড়-একটা নিশ্বাস ফেললেন, ফেলে বললেন—আজ্ঞে, সে কথা খুবই মনে আছে। আর সেই জন্যই এখন বেরুচ্ছি। মানে, একখানা নতুন বই লিখেছি···সেটা নিয়ে এক পাবলিশারের কাছে যাচ্ছি। বলেছে, কপিরাইট নেবে নগদ আশী টাকা দিয়ে। মানে, ঐ আশীটা টাকা নিয়ে আপনার ওখানে···তারপর··মানে, এবারকারের মতো ঐ আশী টাকা নিয়ে আর একটি মাস সময় আমাকে···

আসামী যেমন ভয়ে-ভয়ে হাকিমের কাছে মিনতি জানায়, জয়গোপালের কণ্ঠ তেমনি মিনতিতে ভরা। তাঁর কথা শেষ হলো না। হাতের মালা মাথায় ঠেকিয়ে ভীষণ রকমে মাথা নেড়ে বিরিঞ্চি বলে উঠলো—উঁহু—কিস্তিমিস্তি আর চলবে না! কিস্তি অনেক হয়ে গেছে···সময় অনেক দিয়েছি, আর নয়! এবারে আমার ডিক্রীর বাকী বকেয়া মানে, মোট ঐ এগারোশো বত্রিশ টাকা সাড়ে দশ আনা পুরোপুরি আদায় চাই। দিতে না পারো, ও তারিখে তোমার এ বাড়ী লাটে তুলে বেচে আমার পাওনা-গণ্ডা উশুল···হ্যাঁ, এর আর নড়চড় নয়। কথাটা শেষ করেই বিরিঞ্চি খুব জোরে জোরে মালা জপতে লাগলো—হরেকেষ্ট হরেকেষ্ট হরেকেষ্ট···

বাসু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উঠোনে···হাতে কোদাল · চোখের দৃষ্টি উদাস। বুঝলো, ক্ষয়া-লোকটা মহাজন। জয়গোপালবাবু ওর কাছ থেকে টাকা ধার করেছিলেন···শোধ দিতে পারেন নি বলে মকর্দ্দমা করে ও পেয়েছে কোর্টে ডিক্রী—আর সেই ডিক্রী আদায়ের জন্য বেচারী জয়গোপালবাবুর এই বাড়ী লাটে তুলেছে। হঠাৎ জানলার কপাটে খুট্ করে একটু শব্দ। বাসুর হুঁশ হলো। জানলার দিকে সে তাকালো—দেখলো, ঘরের মধ্যে জানলার পিছনে দু'জোড়া চোখ আতঙ্কে নিস্পন্দ! চাঁপা আর চাঁপার মা। চকিতে এ পরিবারে ভীষণ ট্রাজেডি—বাসুর মনকে আচ্ছন্ন করে তুললো।

বিরিঞ্চির কথা শুনে জয়গোপালবাবু অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে বেদনায়-গলা ভাষায় মিনতি জানালেন—আজ্ঞে, আমি নেহাৎ নিরুপায়। যে করে আমাদের দিন চলেছে!·· আর এই একটিবার আমাকে দয়া করতেই হবে। আমি হাতজোড় করে প্রার্থনা জানাচ্ছি···না হলে এ-বয়সে আমাকে পথে দাঁড়াতে হবে।

হাতের মালা মাথায় ঠেকিয়ে বিরিঞ্চি বললে—তা তো দাঁড়াবেই! স্নবুদ্ধি দিলে যদি তা না নাও, আমার অপরাধ?…আমি তোমাকে বারবার যে-কথা বলছি, আর সে কথা বুঝে কাজ করবার জন্য বারবার কিস্তি নিয়ে সময় দিচ্ছি·· আমার সে বুদ্ধি তো তুমি নেবে না! কাজেই হরেকেষ্ট হরেকেষ্ট হরেকেষ্ট…

জয়গোপাল যেন ভেঙ্গে দুমড়ে পড়বেন! তিনি বললেন—আজ্ঞে…

তাঁর কথা শেষ হলো না। চাঁপা এলো এক গেলাস জল নিয়ে বিরিঞ্চির জন্য…সেদিকে বিরিঞ্চির লক্ষ্য নেই। সে বলে উঠলো—তোমাকে আমি বলি নি…আজ দু'বছর হলো গিন্নি মারা গেছেন… ভেবেছিলুম, ও পাপ আর ঘরে আনব না—কতকগুলো বাজে খরচ… তা তোমার মেয়েটি বেশ ডাগর-ডোগর হয়ে উঠেছে…তোমার হাড়ির হাল—হাঁড়ি ঢন্‌ঢন্, মাথার উপর আদালতের ডিক্রী, সেই সঙ্গে কন্যাদায়? …বরাবর তোমাকে বলছি, মেয়েটিকে আমার হাতে দাও, তোমার ডিক্রীর বাকী টাকা আমি বিলকুল মাপ করে দেবো—কন্যাদায়ে উদ্ধার পাবে, তোমার এ ভিটেও রক্ষা হবে। তা তুমি…

এই পর্য্যন্ত বলে তার চোখ পড়লো চাঁপার দিকে…চাঁপা যেন কাঠের পুতুল দাঁড়িয়ে আছে—হাতে জলের গেলাস। বিরিঞ্চির বুকের ভিতরটা আলোয় আলো হয়ে উঠলো! এক-গাল হেসে বিরিঞ্চি বললে—এই যে চাঁপারাণী…জল এনেছো! দাও, দাও…বলে আগ্রহে চাঁপার হাত থেকে গেলাস নিয়ে তখনি পানে নিঃশেষ। চাঁপার হাতে গেলাস ফিরিয়ে দিলে—চোখ কিন্তু চাঁপার দিক থেকে ফিরতে চায় না! বিরিঞ্চি বললে—মেয়েটি খাশা হয়েছে…বাঃ!

বিরিঞ্চির চোখের চাহনি আর মুখের এই কথা চাঁপার সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুন ছড়িয়ে দিলে! গ্লাস নিয়ে তখনি সে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বিরিঞ্চি ফিরে তাকালো জয়গোপালের দিকে···বললে—কি, তোমাকে আমি বারবার এই কথা বলছি না?

দেনার ভারে জয়গোপাল একে নির্জীব··তার উপর বিরিঞ্চির এই অকথ্য অপমান! তাঁর মনে হলো, এততেও তিনি বেঁচে আছেন কি করে? মানুষের মরা এমন কঠিন! তাঁর মনে হচ্ছিল চেতনা আছে? না, তিনি পাথর হয়ে গেছেন?

বিরিঞ্চি ঠায় চেয়ে আছে জয়গোপালের দিকে। তার চোখে পলক পড়ে না! বিরিঞ্চি বললে—কি···জবাব দাও।

অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে জয়গোপাল বললেন—এ আপনি কি বলছেন··· পাগলের মতো! আপনার সঙ্গে আমার এই মেয়ের বিয়ে! আপনি কি তামাসা করছেন!

বিরিঞ্চির বুকখানা ধ্বক্ করে উঠলো। চতুর মহাজন···টাকার মায়া তার কাছে যত প্রকাণ্ডই হোক, কিশোর বয়সের এই মেয়েটা···এর লোভ···নাঃ, এ-লোভ কাটানো সহজ নয়! এখনো···মানে, চমৎকার সুযোগ···খানিকটা চাপ···খানিকটা নোলকাছি···মনের মধ্যে বুদ্ধির চমক! সে বলে উঠলো—আহা, হা-হা, আমি এখনি তোমাকে হ্যাঁ বলতে বলছি না। নিলেমের এখনো দু-তিনদিন দেরী আছে তো···বিবেচনা করে ছাখো।···তোমার পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করো।···এ ব্যাপারে ওঁরা···মানে, হেঁ হেঁ কথায় বলে, স্ত্রীবুদ্ধি! বুঝলে কিনা, তোমার সঙ্গে এতদিনকার সম্পর্ক! তা—হরেকেষ্ট···হরেকেষ্ট···হরেকেষ্ট···

বাসু স্তম্ভিত! তারো চোখে পলক পড়ে না! সে চেয়ে আছে বিরিঞ্চির দিকে। বুকের মধ্যে যেন সাতটা সাগর তুফান তুলেছে! একবার তাকালো ঐ খোলা জানলার দিকে···দেখলো, চাঁপার মা জানলার ধার থেকে সরে গেলেন।

এদিকে জয়গোপাল নিরুত্তর। বিরিঞ্চি ওস্তাদ লোক। ভাবলো, এখন আর বেশী ঘাঁটায় না। সে উঠে দাঁড়ালো…জয়গোপালের দিকে তাকিয়ে বললে—আজ তাহলে উঠি জয়গোপালবাবু! তুমি বিবেচনা করে ছাখো, না হলে…বিপদের গুরুত্বটা বুঝছো তো! আমার সাফ কথা…হয় টাকা আমার পুরোপুরি চাই, না হয়…যা বলেছি, তোমার এই মেয়ে! হরেকেষ্ট হরেকেষ্ট হরেকেষ্ট…

বিরিঞ্চি চললো সদরের দিকে—জয়গোপাল তার পিছনে। সদর পর্য্যন্ত বিরিঞ্চিকে এগিয়ে দিতে চলেছেন ষ্টীমারের পিছনে-বাঁধা বোটের মতো! বাসু দেখছে দুজনকে। সদর পার হয়ে বিরিঞ্চি বেরুলো পথে।…বাসু ফিরে তাকালো সেই জানলার দিকে…জানলার পিছনে চাঁপার মা…তাঁর চোখে মুখে কে যেন কালো কালি মাখিয়ে দেছে! চাঁপা? চারিদিকে চেয়ে বাসু চাঁপার চিহ্ন দেখলো না!

৭

সন্ধ্যা হয়-হয়। বাসুর বাড়ীতে মধু আর রঘুঠাকুরের উদ্বেগের সীমা নেই। সকাল থেকে দাদাবাবুর কোনো উদ্দেশ নেই…কোথায় গেল? কী কাজ যার জন্য নাওয়া-খাওয়া ভুলে এখনো পর্য্যন্ত? এপাড়া ওপাড়া এপথ ওপথ ঘুরে দুজনে সন্ধান করেছে। কাকে কি জিজ্ঞাসা করবে? তবু যাকে সামনে পেয়েছে, প্রশ্ন করেছে—আমাদের দাদাবাবুকে দেখেছেন…কোনো জবাব মেলে নি। এখন সন্ধ্যাবেলায় দুজনে ক্লান্ত অবশ হয়ে নিঃশব্দে বসে শুধু ভাবছে আর ভাবছে। যা ভাবছে, কেউ তা মুখ ফুটে কাকেও বলতে পারছে না! সে চিন্তায় দুজনেই শিউরে একেবারে কাঁটা!

হঠাৎ নিশ্বাস ফেলে মধু বললে—কোথায় যে মানুষটা গেল···

—আমার মনে হয় হয়তো কলেজে···

তাকে ধমক দিয়ে মধু বললে—তুমি জানো তো! আজ রবিবার··· ছুটি···কলেজ যাবে কি? তাছাড়া জামা জুতো সব ঘরে রয়েছে··· ঐ ফতুয়া গায়ে···পাগল!

রঘু বললে—হুঁ···তাহলে···

মধু আবার উঠে দাঁড়ালো। বললে—নাঃ, আবার একবার বেরিয়ে দেখি। তুমি থাকো ঠাকুর···বাড়ীটা না হলে আলগা থাকবে।

মধু এগুলো ফটকের দিকে—সেই বুড়ো মালী এসে পিছনে ডাকলো—ইয়ে মধু ভাই···

পিছু-ডাকে মধু বিরক্ত হলো। মালীর পানে ফিরে ঝাঁজালো গলায় বললে—ভালো আপদ! বেরুচ্ছি আর তুই পিছু ডাকলি! —কি—চাই কি···

করুণ কণ্ঠে মালী বললে—মু-অ-কুদর খণ্ড?

মধু তাকে জোর ধমক দিয়ে বললে—ধুত্তোর কুদর খণ্ড! মানুষটার কোনো পাত্তা নেই···ভেবে মরছি···আর ও এসে বলে—মু-অ কুদরখণ্ড।

ধমক খেয়ে মালী থ' হয়ে দাঁড়ালো।—মধু এলো ফটকের কাছে। যেমন আসা···দেখে, বাসু ফটকে ঘুরছে—ধুতি মালকোঁচা করে পরা, মুখে চূণ, গায়ে ধূলাকাদা, গায়ের ফতুয়া ধূলাকাদা-মাখা বাসুর হাতে কোদাল।

দেখে মধুর দুচোখ যেন ঠিকরে পড়বে! সে যেন চমকে উঠলো, বললে—দাদাবাবু···

মধুর দিকে চেয়ে বাসু ছোট্ট জবাব দিলে—হ্যাঁ।

মধু বললে—তোমার কাণ্ড কি বলো তো···সারাদিন কোথায় ছিল? কি করছিলে? কোদাল হাতে এখন এই সন্ধ্যার সময় ধুলাকাদা মেখে ফিরছো! কোথায় কুস্তি করতে গিয়েছিলে?

হাসতে হাসতে বাসু বললে—থাম্ থাম্···আমি এখন চান করবো। তুই চট্ করে এক গ্লাস জল নিয়ে উপরে আয়···ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে রে।

এ-কথা বলে কোদালখানা একদিকে ছুড়ে ফেলে বাসু টক্‌টক্ করে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল। গিয়ে মুখ-পা-হাত ধোয়া নয়, সুইচ টিপে আলো জ্বেলে বড় আয়নার সামনে দাঁড়ালো—দাঁড়িয়ে মুখখানাকে এরকম, ওরকম সব-রকমে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা।

মধু ঢুকলো ঘরে, হাতে গ্লাসে ভরা সরবৎ। আরশির সামনে বাসুর অঙ্গভঙ্গী দেখে মধু বলে উঠলো—এ আবার কি? গায়ে এই ধূলোকাদা ··মুখ-হাত ধোয়া নয়, চান করা নয়, এসেই আরশির সামনে···

বাসু ফিরলো, হাসতে হাসতে বললে—আচ্ছা মধু ত্থাখ্ তো··· বেশ ভাল করে আমার দিকে চেয়ে ত্থাখ্···আমার চেহারাখানা ধাঙড়ের মতো? আমাকে দেখলে ধাঙড় মনে হয়?

প্রশ্ন শুনে বাসু থ', দুচোখ এত বড় করে সে বললে—তার মানে?

—হ্যাঁ রে, ধাঙড়!···আচ্ছা, এই মাথার চুলগুলো···হুঁ···খোঁচা খোঁচা, বিশ্রী করে কাটা···একদম্ গেঁয়ো! সে তাকালো আয়নার দিকে···তাকিয়ে বললে—আমার নিজেরই কেমন কেমন লাগছে···

এই পর্য্যন্ত বলে সে আবার ফিরলো মধুর দিকে, বললে—শোন্, কাল সকালেই বেশ ভালো দেখে একটা নাপিত ধরে আনবি···বুঝলি।

মধুর বিস্ময় আর কাটে না!

সে বললে—ভালো দেখে নাপিত ?

বাসু বললে—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ। মানে, একটু সভ্য-ভব্য নাপিত··· সৌখীন ছাট জানে !

মধু বললে—সৌখীন ছাট !

বাসু বললে—হ্যাঁ রে, মানে,···মানে, এখানে সহরের যেমন দস্তুর রে! না হলে ত্থাখ্ না···এই···একে ছাট বলে? হেঁঃ···তার উপর এত-বড় একটা টিকি! ধেৎ!

মধু বললে—আনবো। এই নাও সরবত···জল চাইলে! কিন্তু কি ব্যাপার, বলো তো? কোথায় ছিলে সারাদিন ?

মধুর হাত থেকে গ্লাস নিয়ে বাসু এক-চুমুকে সরবতটুকু নিঃশেষ করলে। তারপর বললে—চট্ করে তেল··চান করবো। হাত দুটোয় কী ব্যথা···টন্‌টন্ করছে !

সন্ধ্যাবেলা···বাসুর বাড়ীতে বাসু স্নান করছে···

ওখানে জয়গোপালের গৃহে···রোয়াকের উপর সেই তক্তাপোষ। তক্তাপোষে বসে মা···উদ্বেগের ভারে বুক ভারী···চোখে-মুখে বেশ কালো ছায়া। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বেলে চাঁপা এসে মায়ের কাছে দাঁড়ালো। মা আর মেয়ে···কারো মুখে কথা নেই। দুজনের মন কোথায় কিসের সন্ধানে ভেসে চলেছে, কে জানে! মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি···বাতাসে ভেসে আসছে। মা ডাকছেন, ঠাকুর, এত পাপ করেছি, যার জন্য দুর্ভোগ আর অশান্তির বিরাম নেই ?

জয়গোপালবাবু বাড়ী ঢুকলেন। তাঁকে দেখে মা এবং মেয়ে··· দুজনেই যেন চেতনা পেলেন। এগিয়ে এসে মা বললেন—কি গো, কিছু হলো ?

জয়গোপাল বললেন—পাবলিশারের কাছ থেকে ঐ আশি টাকা নিয়ে বিরিঞ্চির কাছে গিয়েছিলুম। টাকা সে নিলে না! কত মিনতি করলুম, পায়ে ধরলুম! তবু না—তার ঐ এক কথা!

জয়গোপালবাবু মস্ত একটা নিশ্বাস ফেললেন। মা বললেন—যাক, এখন আর ও নিয়ে ভেবো না। সারাদিন যে কষ্ট গেছে, এসো, মুখ-হাত ধোও···একটু-কিছু মুখে দাও, তারপর···মা-কালীর উপর বিশ্বাস রাখো। তিনি কখনো···মায়ের কথা শেষ হলো না। নিশ্বাসের বাষ্পে কথার শেষটুকু বাতাসে মিশে গেল।

জয়গোপাল গায়ের জামা খুলে চাঁপার হাতে দিলেন। চাঁপা জামা নিয়ে ঘরে গেল রাখতে···চাঁপাকে উদ্দেশ করে মা বললেন—ঐ ডাবটা আছে, কেটে জল এনে দে মা।

নিশ্বাস ফেলে জয়গোপাল বললেন—অত্যন্ত ইতর···বলে, আমার এক কথা—তোমার মেয়ে চাঁপার সঙ্গে···

মায়ের দু'চোখ কপালে উঠলো! মা বললেন—মিন্‌সে সত্যি তাই চায়? আমি ভাবি, চাঁপার ঠাকুর্দার বয়সী···বুঝি, তামাসা করে!

জয়গোপাল বললেন—না।···তুমি জানো না, ও কত-বড় চামার! জানো, ওর স্ত্রী দু'বছর আগে মারা গেছে—তার চিকিৎসা করায় নি। তখন এই দেনার জন্য আমার নামে কাছারিতে নালিশ করেছে—আমি মাঝে মাঝে ওর কাছে যাই হাতে-পায়ে ধরতে। সেই সময় স্ত্রীর জন্য একটা ডাক্তার কি, কম্পাউণ্ডার পর্য্যন্ত ডাকে নি। বিরিঞ্চির এক ভাগ্নে···আমার সামনে এসে ওকে বললে—বড্ড কষ্ট হচ্ছে মামীমার—একজন ডাক্তার! তাতে ও হতভাগা বললে—ডাক্তারে কি করবে? যে সারবার, ডাক্তার না দেখালেও সে ঠিক সারবে। আর যে যাবার,

ধন্বন্তরি এলেও তাকে সারাতে পারবে না। বেহায়া বললে, বহুৎ দিন তো বেঁচেছে···বাঁচার মানে তো খরচ···যদি মরে, মরবে। তার জন্ত আর মিছে পয়সা খরচ করা কেন?···এমন লোক!

শুনে মা শিউরে উঠলেন। বললেন—তাহলে?

জয়গোপাল বললেন—ভাবছি···কিন্তু কি করে তা সম্ভব হবে? মানে, ভাবছি, কাল একবার কলকাতায় যাবো, গিয়ে দু'চারজন উকিলকে তো জানি, তাদের ধরে দেখবো যদি ঐ ডিক্রির টাকাটা কেউ দিয়ে দেয়···মানে, দলিল লিখে দেবো ডিক্রির টাকা কাছারিতে জমা দিয়ে এ দেনার জন্ত সে-লোকের নামে বন্ধকী খত লিখে বাড়ীখানা বাঁধা দেবো। এছাড়া বাড়ী রক্ষা করবার আর কোনো উপায় নেই।

মা বললেন—তাই করো। না হলে···তোমাকে বাঁচতে হবে তো! তার ওপর সত্যি, মেয়ে ডাগর হয়ে উঠেছে, তার বিয়ে···

বাধা দিয়ে অসহায়ের ভঙ্গীতে জয়গোপাল বলে উঠলেন—জানি, জানি—আমাকে কোনো কথা মনে করিয়ে দিয়ো না। সব আমার মনে কাঁটার মতো খচখচ করছে সর্ব্বক্ষণ···আমি আর ভাবি না। ভেবে লাভ? অদৃষ্টের উপর সব ভার চাপিয়ে দিয়েছি। না হলে পাগল হয়ে যেতুম!

মায়ের মুখে কথা নেই। দৃষ্টি উদাস···স্বামীর মুখে নিবদ্ধ।

···চাঁপা এলো পাথরের বাটীতে ডাবের জল নিয়ে। বাটীটা বাপের হাতে দিয়ে গাঢ় কণ্ঠে চাঁপা বললে—খাও···

পরের দিন সকালবেলা···

জয়গোপাল রোয়াকে সেই তক্তাপোষের উপর বসে আছেন···দুঃখের ভারে এমন ভেঙ্গে পড়েছেন, যেন চেতনা নেই! পাশে ঘরের

জানলা খোলা—সেই জানলার পিছনে চাঁপা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে··· মাঝে মাঝে বাপের পানে চেয়ে দেখছে। তার জন্য বাপের দুশ্চিন্তা কত বেশী—উপলব্ধি করে অস্বস্তির গ্লানিতে সে যেন···

মা গেলেন রোয়াকে জয়গোপালের .কাছে, বললেন—এত কি ভাবচো ?

জয়গোপাল বললেন—ভাবছি, আর একবার বিরিঞ্চির কাছে যাই··· তার পা দুখানা ধরে···

মা বললেন—আবার ? কাল তোমার ঐ বইওলার দেওয়া টাকা নিয়ে দিতে গেছ, নেয়নি···হাঁকিয়ে দেছে—ইতরের মতো ঐ কথা বলে—আবার তার কাছে ?

নিশ্বাস ফেলে জয়গোপাল বললেন—হুঁ। কিন্তু বাড়ীখানা ?

মা বেশ ঝঙ্কার তুলে বললেন—যাক বাড়ী, গাছতলা আছে। তোমাকে নিয়ে মেয়ের হাত ধরে গাছতলায় থাকবো।···তা'বলে মেয়েটাকে ঐ কসাইবুড়োর হাতে···

জানলার পিছনে দাঁড়িয়ে চাঁপা···আকাশের পানে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে···কানে ভেসে আসছে মায়ের আর বাপের কথা।

জয়গোপাল বললেন—তা নয়···আমি তা বলছি না! মানে, বাড়ীখানা···ভাবছি, হঠাৎ যদি আমি চোখ বুজি, মেয়ের হাত ধরে তুমি কোথায় দাঁড়াবে!

মা নিরুত্তর। ঘরের মধ্যে চাঁপার সর্ব্বাঙ্গ ঝন্‌ঝন্ করে কেঁপে উঠলো! সে এলো বাহিরে রোয়াকে। দুজনের দিকে চেয়ে গাঢ়কণ্ঠে চাঁপা বললে—তোমরা অমত করো না···ঐখানেই···

মা চমকে উঠলেন। মেয়ের দিকে চেয়ে মা বললেন—তুই কি বলছিস চাঁপা!

অকম্প গম্ভীর কণ্ঠে চাঁপা বললে—হ্যাঁ মা, বাবার এই অপমান লাঞ্ছনা···তার উপর বাড়ী···

জয়গোপাল নিরুত্তরে মেয়ের পানে চেয়ে···তিনি যেন স্বপ্ন দেখছেন। মা বললেন—বাড়ী! ··এ বাড়ী বাঁধা দিয়েছিলুম তোর দিদিকে রক্ষা করতে···তার বিয়ে দিতে···দিদির বিয়ে হলো···বিয়ের পর ছ'মাস কাটলো না, সে চলে গেল। বাড়ী দিয়েও সেটাকে রাখতে পারিনি! আর আজ এই বাড়ী রাখতে আর-একটাকে জলে দেবো? বাপ-মা হয়ে···

এঁদের এই কথাবার্তার মধ্যে বাসু কখন কোদাল হাতে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে, তিনজনের কেউ তা নজর করেন নি। বাসু এসে এখানকার শুদ্ধ গম্ভীর ভাব দেখে···তারপর এই সব কথাবার্তা শুনে সাড়া তোলে নি···নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে শুনছে। মনে হচ্ছে, তার সর্ব্বাঙ্গে কে যেন বিছুটির চাবুক মারছে ··তার হাত-পা যেন বাঁধা···অসহায়ের মতো বিছুটীর জ্বালা সহ্য করছে! সে আর চুপ করে থাকতে পারলো না! এগিয়ে এসে ডাকলো—মা···

তিনজনেই তার পানে চেয়ে দেখলেন। মা বললেন—ও' তুই এসেছিস বাবা! তা আজ···আজ না হয় থাক্! আমাদের একটু···

বাধা দিয়ে জয়গোপাল বললেন—আহা···বেচারী, গরীব মানুষ··· দু'পয়সা প্রত্যাশা করে' এসেছে।

শুনে মা বললেন—আচ্ছা, তাহলে আজ বাইরের উঠোন থাক, ভিতরের উঠোনটা বরং···এ-কথা বলে মা চাঁপার পানে তাকালেন, চাঁপাকে বললেন—তুই যা মা, ভিতরের উঠোনে নিয়ে যা ওকে! আজ সেখানে···

বাসুকে নিয়ে চাঁপা গেল বাড়ীর অন্দরে যে উঠোন—সেইখানে।

বাসুর বাড়ীতে আবার বিভ্রাট। দুধ জ্বাল দিয়ে বাটীতে সেই দুধ নিয়ে দাদাবাবুকে দেবে খেতে, দাদাবাবু নেই! আজ আবার কি হলো? কলেজ খোলা···রবিবার নয়···মধুর মনে অস্বস্তি! সে এলো নীচে বাগানে। বুড়ো মালীর সঙ্গে দেখা। সে চুপ করে বসে গাঁজার কলকে ভরছে। মধু তাকে জিজ্ঞাসা করলো দাদাবাবুকে দেখেছিস্?

মালী বললে—হুঃ মু—অ···কুদর নেইকিরি হোই সেথাকু···বলে মালী পথের দিক দেখালো।

অস্বস্তিতে মধু তিড়বিড়িয়ে উঠলো। সে বললে—আবার তোর কুদর! নাঃ, মুস্কিল করলে, দেখছি!

:

জয়গোপালের বাড়ীর রোয়াক। জয়গোপাল বললেন—আমি তাহলে আর দেরী করবো না···বেরুই। কাল যা বলছিলুম, ডিক্রির টাকাটা কারো কাছ থেকে জোগাড় করে খুব চড়া সুদে তার কাছে নতুন করে আবার বন্ধক! এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

ভিতরের উঠোনে বাসু জঙ্গল কাটছে···কাজ আজ চলেছে ঢিমে-চালে। কাজে মন নেই! মন তার এই পরিবারের দুঃখে আকুল! হঠাৎ দেখলো চাঁপা ঘরের বাহিরে ভিতর-দিককার রোয়াকে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে। মুখ মলিন, দু-চোখ···বাসুর মনে হলো, শ্রাবণের মেঘের মতো জলভরা যেন! বাসুর বুকখানা দুলে উঠলো। তরুণ মন বেদনায় আর্দ্র। কোদাল রেখে নিঃশব্দে সে এলো চাঁপার কাছে। চাঁপার কোনোদিকে লক্ষ্য নেই···শূন্যে চেয়ে আছে।

কোনোমতে সাহস সঞ্চয় করে বাসু বললে অস্ফুট মৃদু কণ্ঠে—আ—আ—আপনি···

সে-স্বরে চমকে চাঁপা ফিরে তাকালো, বাসু বললে—ক্—ক্…

চাঁপার উপর দু'চোখের অপলক করুণ দৃষ্টি…বাসু বললে—আপনি ক্—ক্—কাঁদছেন ?

চকিতে চাঁপার চোখের ঝর্ণা থামলো। একটা ধাঙড়…তার এমন স্পর্ধা! চাঁপা বললে—আমি কাঁদছি ?

সে-স্বরে বাসু ভড়কালো।…নিমেষ-ক্ষণ। তারপর সে বললে—আজ্ঞে, হেঁ হেঁ…আপনার চোখে জল !

চাঁপার খেয়াল হলো—হুঁ…এ-কথা অস্বীকার করা চলে না ! ভাবলো, কিন্তু এ ? সে একটু ঝাঁজালো গলায় বললে—চোখে জল ? তোর ভারি আস্পর্ধা দেখছি ! যা, চলে যা এখান থেকে। চাঁপা দিলে তাকে ধমক।

বাসুর মনে চকিত-দ্বিধা ! সে কিন্তু নড়লো না। দেখে চাঁপা আবার দিলে ধমক—গেলি ?

বাসু তার মনকে ঠিক করে তুলেছে, ভয় নয়। বাসু বললে—আজ্ঞে, আপনি রাগ করছেন কেন ? বাসুর কণ্ঠে দরদ এবং বিনম্র মিনতি। চাঁপা তাতে টললো না ! সে বললে—হ্যাঁ, রাগ করছি। তুই যা।

তবু বাসু নড়ে না। চাঁপা বললে—বটে ! দেখবি তবে মজা ? মাকে ডাকবো ? এটুকু বলার পর চাঁপার কণ্ঠে তার অজ্ঞাতেই ফুটলো স্বর—মা…

বাসু এবার সঙ্কুচিত হলো। সে বললে—না, না—কাকেও ডাকতে হবে না। আমি যাচ্ছি।

চাঁপার ঐ মা-ডাক ঘরে মায়ের কানে পৌঁছুলো। মা বললেন মেয়েকে উদ্দেশ করে—আমাকে ডাকছিস ?

বাসু তখন বেত্রাহতের মতো কুণ্ঠিতভাবে সেখান থেকে চলে যাচ্ছে—বাসুর উপর চাঁপার দৃষ্টি নিবদ্ধ। চাঁপা বললে—হ্যাঁ···না···মানে···

এর বেশী চাঁপা আর কোনো কথা বললে না। দেখলো, বাসু কোদাল হাতে আগাছা কাটছে···এদিক পানে বাসুর আর দৃষ্টি নেই! এত দুঃখেও বাসুর আচরণে চাঁপার মনে কেমন একটু কৌতুকের রেখা!

এমনি সময়ে ওদিক থেকে বিরিঞ্চির সাড়া এলো বাতাসে ভেসে—কৈ গো জয়গোপালবাবু, বাড়ী আছো?···সঙ্গে সঙ্গে জয়গোপালের কণ্ঠ-আজ্ঞে হ্যাঁ—এই যে···যাই। তারপর মায়ের কণ্ঠ—আজ সকালে আবার কি মনে করে হতভাগা···

চাঁপার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠলো। নিঃশব্দে সে গিয়ে ঢুকলো ঘরে মায়ের কাছে। বিরিঞ্চির গলা বাসু শুনেছে—সেই সঙ্গে সে শুনেছে জয়গোপালবাবুর কথা আর মায়ের মন্তব্য! আবার কি হয়, বাসুর মনে প্রচণ্ড কৌতূহল!···কোদাল রেখে কাজ ফেলে সে দাঁড়ালো—সদর আর অন্দরের মাঝখানে উঠোনে যে দরজা, সেই দরজার পিছনে।

৮

সেই রোয়াক···রোয়াকে তক্তাপোষ পাতা। তক্তাপোষের ধারে বেতের মোড়া। বিরিঞ্চি এসে মোড়ায় বসেছে। হাতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ। সেই ব্যাগ খুলে সে বার করেছে মোটা একখানা পাঁজি আর গুটোনো হলদে রঙের কোষ্ঠীপত্র—জয়গোপাল তক্তাপোষের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। দরজার আড়াল থেকে বাসু এ দৃশ্য দেখলো। তারপর তার শ্রুতিযুগল···

জয়গোপালের দিকে চেয়ে বিরিঞ্চির সেই জপের মন্ত্র আওড়ানো—হরেকেষ্ট…তারপর কণ্ঠে সুধাবাণী…মমতায় দরদে যেন গলে পড়ছে!

বিরিঞ্চি বললে—কাল তুমি সেই যে আমার ওখান থেকে চলে এলে, সেই থেকে তোমার কথা চিন্তা করে আমার মনটা কেমন… …হেঁ হেঁ রাত্রে…বললে বিশ্বাস করবে না ভাই, চোখে একফোঁটা ঘুম নেই! শুধু তোমার কথা ভেবেছি…হেঁ হেঁ…বন্ধু-মানুষ…দু'-দুটো এত-বড় দায়!—তোমাকে রক্ষা করা চাই!…না হলে বুঝলে কিনা·· বিছানা ছেড়ে উঠলুম। আলো জ্বেলে পাঁজি খুলে বসলুম। তারপর এই কোষ্ঠীখানা!…আমার কোষ্ঠী! কাগজ-কলম নিয়ে কোষ্ঠী খুলে গণনা! এককালে এ-সবের চর্চ্চা করেছি তো…

জয়গোপাল কাঠ হয়ে শুনছেন…তাঁর চোখের সামনে শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী! বিশ-হাত কোষ্ঠীখানা মাদুরের মতো গুটোনো ছিল…সেটা ফর্‌ফর্‌ করে খুলে বিরিঞ্চি মেলে ধরলো…কোষ্ঠীর ওদিকটা রোয়াক পার হয়ে ঝুলে পড়লো এবং সেই কোষ্ঠীখানা গুটোতে গুটোতে বিরিঞ্চি বললে—এই…এই…এই যে দেখছো বৃহস্পতি, এর জোরে এখনো বিশ বচ্ছর আমি বাঁচবো। তার আর নড়চড় নেই। তাহলে?… আর এই ত্যাখো পাঁজি…বলেই পাঁজি খুলে বিরিঞ্চি দেখালো শুভদিনের নির্ঘণ্ট-ছাপা পাতাখানা, বললে—এই সামনেই শুভদিন। এই কুষ্ঠি—আর পাঁজি—তোমার সামনে ধরে দিলুম। তুমি নিজে ত্যাখো—চাও যদি কোনো জ্যোতিষীকে দেখাও। দেখিয়ে একবার বলো—হ্যাঁ…আজই আমি আদালতে গিয়ে দরখাস্ত দাখিল করে আসবো—ডিক্রি তুলে নেবো। এই ত্যাখো, উকিলকে দিয়ে সে-দরখাস্ত পর্য্যন্ত লিখিয়ে এনেছি। শুধু সইয়ের ওয়াস্তা! তুমি একটিবার বলো, হ্যাঁ। তাহলেই…

সঙ্গীন মুহূর্ত্ত! বাসু ওখানে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে

পারলো না। মনে হলো, ওখানে এবার একটা-কিছু···নিঃশব্দে সে এসে দাঁড়ালো বাহিরের উঠোনে···রোয়াকের এদিকে একটা পেয়ারা-গাছ···সেই গাছের আড়ালে।

জয়গোপালের মুখে কোনো কথা নেই। তার পানে চেয়ে বিরিঞ্চি মালা-জপ করছে—উত্তরের প্রত্যাশায়। দু'মিনিট, চার মিনিট, পাঁচ মিনিট। বিরিঞ্চির ধৈর্য্য বাঁধ মানলো না। সে বললে—হেঁ হেঁ বাড়ীতে মানে, তোমার পরিবারকে সব কথা বলেছো ?

জয়গোপাল যেন পাথরের মূর্ত্তি—নির্বাক নিস্পন্দ !

বিরিঞ্চি বললে—বলেছো, তোমার কন্যাকে আমি হেঁ হেঁ···হরেকেষ্ট হরেকেষ্ট···

জয়গোপাল তবু তেমনি···নির্বাক নিস্পন্দ !

বিরিঞ্চি অধীর হয়ে উঠলো। সে বললে—কী গো, কথা কইছো না যে !

জয়গোপাল একটা নিশ্বাস ফেললেন···জবাব দিলেন না।

বিরিঞ্চির বুকের মধ্যে যেন সপ্ত সাগর ফুঁশছে তরঙ্গ তুলে !

উদ্বেগে আকুল ··বিরিঞ্চি বললে—তিনি কি বলেন ?

অসহায়ের ভঙ্গীতে একবার ঘরের খোলা জানলার দিকে চেয়ে নিশ্বাস ফেলে জয়গোপাল বল্লেন—না, এ বিয়েতে তাঁর মত নেই।

এমন অসম্ভব জবাব পাবে, বিরিঞ্চি স্বপ্নে ভাবেনি! সে যেন আকাশ থেকে পড়লো! রুদ্ধশ্বাসে সে বললে—মত নেই! বলেই মালা বাগিয়ে ধরে জপ—হরেকেষ্ট···হরেকেষ্ট···

অনুচ্চ কণ্ঠে জয়গোপাল বললেন—না।

—না! বিরিঞ্চি জ্বলে উঠলো, বললে—তাঁকে বুঝিয়ে বলেছো, এ বিয়ে দিলে সব দিকে রক্ষা পাবে···না দিলে ভিটে লাটে বিক্রি হয়ে যাবে!

তখন ঐ মেয়ের হাত ধরে···বিরিঞ্চি রাগে কাঁপছে। তার কণ্ঠ রুদ্ধ হলো।

বিরিঞ্চির দিকে তাকিয়ে জয়গোপাল বললেন—উনি বলেন, মেয়ের হাত ধরে গাছতলায় দাঁড়াবো, তবু এ বিয়ে দেবো না।

বিরিঞ্চির মনে ভিসুভিয়স জ্বলে উঠলো! মনে হলো এর আগুনে··· কিন্তু চতুর মানুষ! বোঝে, এখন রাগ নয়—মাথাটি ঠাণ্ডা রেখে! ···গলার পর্দ্দা নামিয়ে বিরিঞ্চি বললে—একেই বলে মেয়ে-বুদ্ধি! হরেকেষ্ট···হরেকেষ্ট···হরেকেষ্ট···

কিন্তু এর হেস্তনেস্ত করা চাই এবং এখনি। জয়গোপালকে এমন বাগে পাওয়া গেছে···তার ঘাড়ে এত-বড় দুটো দায়। শুধু একটু হুঁশিয়ার! বিরিঞ্চি বললে—তা তুমিও কি জয়গোপালবাবু, তোমার পরিবারের এই কথা মেনে···

আরও সঙ্গীন মুহূর্ত্ত! কে যেন বাসুদেবকে পেয়ারা গাছের আড়াল থেকে এক-পা এক-পা করে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে এলো! বাসুদেব চোখে দেখলো, বিরিঞ্চি যেন খাঁড়া ধরবার উদ্যোগ করছে আর বেচারা জয়গোপালবাবু···সঙ্গে সঙ্গে জানলার পিছনে দু'জোড়া চোখ আতঙ্কে পলকহীন!

জয়গোপালের মুখে কোনো জবাব নেই। বিরিঞ্চি ঈষৎ মিনতিভরা কণ্ঠে বললে—তুমি বন্ধু বলেই বলছি—ডিক্রি মাপ করা ছাড়া আমি তোমাকে নগদ পাঁচশো টাকা দেবো···বেশ ভালো করে ভেবে ভ্যাখো।

বিরিঞ্চির দিকে তাকিয়ে বেশ দৃঢ়কণ্ঠে জয়গোপাল দিলেন জবাব—আজ্ঞে না, এ বিয়ে আমি দেবো না।

বিরিঞ্চি ফোঁশ করে উঠলো। বললে—দেবে না? বটে! আমাকে

অপমান !···আমার নাম বিরিঞ্চি গোঁসাই ! তোমার হাড়ির হাল করতে পারি ! তোমার এ ভিটে তো লাটে তুলবোই, তখন ঐ মেয়ের হাত ধরে পথে পথে···শেষে পেটের দায়ে ঐ মেয়েকে নিয়ে ব্যবসা-বৃত্তি··· যার নাম···

বিরিঞ্চির কথা শেষ হলো না ! তার ঘাড়ে যেন কোথা থেকে বাঘ না কি লাফিয়ে পড়লো ! সঙ্গে সঙ্গে বিষম ঝাঁকানি ! বিরিঞ্চি চীৎকার করে উঠলো—ক্-ক্-কে ?

তার ঘাড় ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে—তোর মুগুর !···বেটা স্থদ-খোর মহাজন। বলেই তাকে ঠেলতে ঠেলতে বাস্থ নামালো উঠোনে। নামিয়ে ঝাঁকানি।

জয়গোপালবাবু শিউরে উঠলেন ! চাঁপা আর তার মা মহা বিপত্তি আশঙ্কা করে লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিয়ে ঘর থেকে রোয়াকে···

জয়গোপাল তাড়াতাড়ি উঠোনে নামলেন···নেমে বাস্থর হাত ধরে আকুল আবেদন—আহা-হা-হা—ওরে···ওরে···ওরে ! বিরিঞ্চি চেঁচাচ্ছে জ-জ-জয়গোপালবাবু।···ছাড়াবার জন্ত জয়গোপালের প্রাণপণ-চেষ্টা। বাস্থ ছাড়বে না ! ভয়ে জয়গোপালবাবুর চীৎকার—ওরে, ওরে, করিস্ কি, মানুষটা মরে যাবে যে ! ভদ্রলোককে ছেড়ে দে।

বাস্থর বয়ে গেছে ছাড়তে ! সে বললে—ভদ্রলোক ! বেটা বুড়ো বাঁদর···বাঁদরামির আর জায়গা পাস্ নে···বাড়ী বয়ে এসে মেয়েদের অপমান ! বেরো···বেরো···বেরো···বলছি।

জয়গোপালের কি আকুলি-বিকুলি ! বাস্থদেব ধাক্কা দিতে দিতে বিরিঞ্চিকে সদর পর্য্যন্ত নিয়ে এলো—তার গলা সে ছাড়ে নি। বিরিঞ্চির চীৎকার—গ্-গ্-গ্ গুণ্ডা লেলানো ! আমি—আমি—আমি পুলিশ কেস করবো।

বাসু জবাব দিলে—বেটা…তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, এখনো বিয়ের সখ! ডিক্রি পেয়েছিস্—বাড়ী বিক্রি করে ডিক্রির টাকা আদায় কর গে…তা নয়, বিয়ে! বেটা মর্কট! বলতে বলতে রদ্দা—বেরো…বেরো বেটা। ধাক্কায় বিরিঞ্চিকে সদরে বার করে দিয়ে বাসু বললে—ফের যদি এ-বাড়ীর চৌকাঠে পা দিবি তো তোর একদিন কি, আমার একদিন! কথাটা বলে সদরের কপাটজোড়া ভেজিয়ে দিয়ে বাসু ফিরলো…বিজয়ী বীরের মতো।

ভয়ে জয়গোপালবাবু যেন আধখানা হয়ে গেছেন! তিনি বললেন—ছি…ছি…ছি…কি করলি বল্ তো!

মায়ের মুখ আতঙ্কে নীল! মা বললেন—বিপদের উপর তুই এ কি বিপদ বাড়ালি বাবা!…কি সর্ব্বনাশ যে হবে! চাঁপা রোয়াকে দাঁড়িয়ে আছে…যেন পাথরে-খোদা মূর্ত্তি!

চকিতের জন্য সকলের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিশ্বাস ফেলে বাসু বললে—কিছু ভাববেন না…হেঁঃ দেখুন না… আমি…

সঙ্গে সঙ্গে পিছনে পরিচিত কণ্ঠে আহ্বান—দাদাবাবু!

চমকে পিছনদিকে তাকিয়ে বাসু দেখে, মধু।

মধুকে দেখে বাসু হতভম্ব!…মধু বললে—এ-এখানে! এমন কোস্তাকুস্তি…

কোনোমতে ধাতস্থ হয়ে বাসু বললে—তুই এখানে?

মধু বললে—তোমায় খুঁজতে নেগেছি। সকালবেলা…বলেছিলে নাপিত ডাকতে—নাপিত ডেকে নিয়ে এনু। তারপর দুধের বাটি নিয়ে ঘুরছি তো ঘুরছি…তোমার দেখা নেই! বাজারের টাকা দ্যাও কি…

চারদিকে ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছি—হঠাৎ এ'বাড়ীর মাঝে তোমার গলার আওয়াজ পেলুম…পায় থমকে দাঁড়ানু। আমাদের দাদাবাবু না? এসে চক্ষে দেখি…

কথাগুলো জয়গোপালবাবুরা একাগ্র মনে শুনলেন। তাঁদের বিস্ময়ের মাত্রা সীমা ছাপিয়ে উঠেছে! মধুকে উদ্দেশ করে জয়গোপালবাবু বললেন—দাদাবাবু! তার মানে?

মধু বললে—আজ্ঞে। আমাদের দাদাবাবু। রাধানগরের জমিদার-বাবু আমাদের কর্ত্তাবাবু—তেনার ছেলে।

জয়গোপালের মনে হলো, তিনি যেন স্বপ্ন দেখছেন! স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো তিনি বললেন—জমিদারবাবুর ছেলে!

মধু বললে—আজ্ঞে, হ্যাঁ। এখানে এয়েছেন কলকাতার কলেজে নেকাপড়া করতে। ঘাটের দিকে যেতে ঐ যে বাড়ী আর বাগান, সেই বাড়ীতে থাকেন।

জয়গোপাল তাকালেন বাসুর দিকে—মায়ের দৃষ্টিও বাসুর মুখে নিবদ্ধ—তাঁদের চোখে প্রচণ্ড বিস্ময়! মধুর দিকে চেয়ে বাসু বললে—থাম্, থাম্, তোকে আর বক্তিমে করতে হবে না। যা, বাড়ী যা। আমি এখনি বেরুবো নেয়ে খেয়ে…

মধু বললে—বাজার হয়নি…কি খাবে? বাজারের ট্যাকা…

—এই নে চাবি, টাকা বার করে নিগে যা। বলে কোমরে জড়ানো পৈতে থেকে একটা চাবির রিং খুলে বাসু দিলে মধুর হাতে—দিয়ে বললে—আর এক-মিনিট এখানে নয়…যা।

মধু চলে গেল। জয়গোপালবাবু বাসুর দিকে চেয়ে তখনো কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন! মা এলেন বাসুর কাছে, বললেন—ওমা!…তুমি কেমন ছেলে, বাবা…আমি যদি ভুল করি—তুমি কি বলে…বলো তো…

এই পর্য্যন্ত বলে মা তাকালেন চাঁপার দিকে। বললেন—তুই বা কি চাঁপা, বাবাকে দেখে ধাঙড় বলে…

চাঁপার মুখে হাসির ঝিলিক! সে বলে উঠলো—বারে, আমি কি করে জানবো…

বাসুর দিকে তাকিয়ে মা বললেন—ছি ছি ছি, তোমার পানে মুখ তুলে চাইতে আমার…

জয়গোপালের মুখে এবারে কথা ফুটলো। তিনি বললেন—কতবড় ঘরের ছেলে! আমার বাড়ীতে কোদাল হাতে তুমি …

মজা লাগলেও বাসুর মন হঠাৎ শির্‌শির্‌ করে উঠলো! যে কাজ সে করেছে…বিশেষ এঁদের বাড়ী লাটে উঠছে…বাসু বললে—এসব কথা এখন থাক! যা করে বসলুন…এই নিলেমটা যেমন করে হোক… হ্যাঁ…বলুন তো ওর কত টাকার ডিক্রি?

সবিস্ময়ে জয়গোপাল বললেন—ডিক্রি?

বাসুদেব বললে—হ্যাঁ।…ঐ কসাই বেটার থোঁতা মুখ ভোঁতা করতে না পারলে সোয়াস্তি পাবো না। কত টাকা?

জয়গোপাল সে-কথার জবাব দিলেন না। শুধু উদাস নয়নে বাসুর পানে চেয়ে রইলেন। বাসু দিলে তাগিদ—বলুন…

নিশ্বাস ফেলে জয়গোপাল বললেন—অনেক টাকা, বাবা।

বাসু বললে—অনেক মানে, কত?—বলুন…

এরপর উত্তর দিতে হলো। দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে জয়গোপাল বললেন—মানে, কতক দিয়েছি, তা দিয়েও এখনো প্রায় বারোশো টাকা বাকি।

—বারোশো!…বলে বাসু কল্পনা নেত্রে তার জানা পৃথিবীটুকু যেন দেখে নিলে! তারপর নিশ্বাস ফেলে বললে—হুঁ হুঁ!…আচ্ছা দেখি, কি করতে পারি।

বলে সে আর এক মিনিট সেখানে দাঁড়ালো না—বেরিয়ে বাড়ী এলো।

বাড়ী এসে চট্‌পট নাওয়া-খাওয়া সেরে···কলেজে নয়, বাসু ছুটলো তার কলকাতার গার্জ্জেন এটর্ণি-বংশগোপালের কাছে। সেখানে বংশগোপালকে ধরে আবদার, বারোশো টাকা তার এখনি চাই—ভয়ানক দরকার। বংশগোপালের নানা প্রশ্ন—গার্জ্জেন হিসাবে তাঁর কর্ত্তব্য, এত টাকা হঠাৎ কেন দরকার?···সেই সঙ্গে প্রফেশনাল মানুষটি বুকের মধ্যে জেগে ঘা দিচ্ছে! এ টাকা মারা যেতে পারে না—টাকাটার উপর কিছু সুদ হিসাবে ল্যাজে বেঁধে ঘরে ফিরে আসবে। এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে বাসু জানিয়ে দিলে, বাবাকে লিখে এ টাকা আনাতে পারতো—কিন্তু তার অবসর নেই···অর্থাৎ বাসুর জানা একটি নিরীহ ভদ্রলোকের অত্যন্ত বিপদ। এখনি এ টাকা না হলে বাড়ী লাটে উঠবে।

বংশগোপাল বাসুকে দিলেন নগদ বারোশো টাকা। টাকা নিয়ে খুশী মনে বাসু অফিস থেকে এলো চলে। সন্ধ্যার সময় অফিসের কাজকর্ম্ম চুকিয়ে এ সংবাদটুকু চিঠি লিখে মথুরামোহনকে জানাতে বংশগোপাল ত্রুটি করলেন না। চিঠিখানি অফিসের বেয়ারাকে দিয়ে বংশগোপালের নির্দ্দেশ—কাল সকালেই যেন এ চিঠি পোষ্ট করা হয়।

সন্ধ্যা হয় হয়···তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে চাঁপা এলো মায়ের কাছে। মা রোয়াকের উপর সেই তক্তাপোষে বসে আছেন···গভীর উৎকণ্ঠায় নির্ব্বাক নিস্পন্দ···

চাঁপা বললে—তুমি মা, এখনো এমনি করে···

মা তাকালেন চাঁপার পানে···মায়ের চোখের সে দৃষ্টি দেখে

চাঁপা বুঝলো, মায়ের বুকের মধ্যে কি হচ্ছে! আশ্বাসের ছলে চাঁপা বললে—বাবা তো বেরিয়েছেন মা, এমন-কাকেও পাবেন না এখনকার মত এই টাকাটা দিয়ে যিনি…

নিশ্বাস ফেলে মা বললেন—যে আমাদের বরাত মা, আশা করবার ভরসা আর হয় না!

চাঁপা বললে—তাছাড়া ইনি যখন এমন করে বলে গেলেন…অত বড় জমিদারের ছেলে…বললেন, বিহিত করবেন!

মেয়ের পানে উদাস নেত্রে চেয়ে মা বললেন—একরত্তি ছেলে, ও কি বিহিত করবে মা? এ কি রূপকথার গল্প যে ছদ্মবেশে রাজার কুমার এসে…

সদরে কড়া নাড়ার শব্দ…সেই সঙ্গে জয়গোপালের কণ্ঠ—ওমা চাঁপা…

—বাবা এসেছেন।…চাঁপা ছুটে গিয়ে সদরের হুড়কো খুলে দিলে। শুষ্ক উদাস মূর্ত্তি…জয়গোপাল বাড়ী ঢুকলেন। মুখে কোনো কথা নেই! তিনি এলেন রোয়াকে। এসে মোড়াখানা টেনে নিয়ে চাঁপার দিকে চেয়ে শ্রান্ত কণ্ঠে বললেন—এক গেলাস জল দে মা।

চাঁপা গেল ঘরে জল আনতে। জয়গোপাল গায়ের জামা ছেড়ে তক্তাপোষের উপর মেলে দিলেন। তক্তাপোষের কোণে ছিল একখানা হাতপাখা। সেই পাখা নেড়ে জয়গোপালকে বাতাস করতে করতে মা জিজ্ঞাসা করলেন—কিছু হলো?

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলে নিরুপায় কণ্ঠে জয়গোপাল বললেন—না, কে দেবে? যেখানে গেছি—বলে, পাড়াগাঁয়ের বাড়ী…হুট বলতেই কি সে-বাড়ীর উপর টাকা দেওয়া যায়? বলে, ও-সব তৌজী-মৌজী তালুক-মুলুক…সে-সব অনেক সন্ধান নিতে হবে। বলে, কলকাতায় বাড়ী হলে যেমন-করে-হোক…

মা নিশ্বাস ফেললেন। চাঁপা এলো—তার হাতে জলের গেলাস্। জয়গোপালবাবু এক-চুমুকে গেলাসের জল নিঃশেষ করলেন। তারপর তিনজনেই নির্বাক।

সদরে বাসুদেবের কণ্ঠ—জয়গোপালবাবু⋯

চাঁপা যেন পাষাণ ভেঙ্গে প্রাণ পেয়ে জেগে উঠলো! বললে—তিনি⋯এসেছেন! বলেই সে ছুটলো সদরের হুড়কো খুলতে।

বাসুদেব এলো জয়গোপালের কাছে, বললে—টাকা এনেছি⋯এই নিন! বলে এ-পকেট থেকে ও-পকেট থেকে বুক-পকেট থেকে নোটের আলাদা-আলাদা তাড়া বার করে গুণে বারোশো টাকা সে দিতে গেল জয়গোপালের হাতে। জয়গোপাল টাকা নেবার জন্য হাত বাড়ালেন না। বাসুর দিকে তাকিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে তিনি বললেন—এ টাকা⋯

উৎসাহিত কণ্ঠে বাসু বললে—হ্যাঁ। মানে, এ টাকা কাল কাছারিতে গিয়ে বেলা দশটার সময় আপনার উকিলের হাত দিয়ে জমা দেবেন, ব্যস্⋯তাহলেই নিলেম বন্ধ!⋯নিন, টাকাটা রাখুন।

জয়গোপাল বললেন—এ টাকা কিছু মনে করো না, বাবা⋯তোমার এ টাকা নেবো না⋯নিতে আমি পারি না⋯

বাসুদেব অবাক! সে বললে—কেন?⋯টাকার দরকার, আর আপনি নেবেন না?

নিশ্বাস ফেলে জয়গোপাল বললেন—না।

বাসু বললে—কিন্তু আপনি কাল বলছিলেন, অন্য জায়গা থেকে ধার করবেন।⋯এ টাকাটা আমার কাছ থেকে ধার বলেই নিন! ইজ্জৎ বাঁচান!

এতখানি যার দরদ, হোক সে বয়সে বালক, তাকে ফেরানো

অসম্ভব। জয়গোপাল বললেন—নিতে পারি···এ টাকার জন্ম আমার কাছ থেকে রীতিমত যদি বন্ধকী-দলিল তুমি নাও।

হাসতে হাসতে বাসু বললে—নেবো। কিন্তু দলিলপত্র রেজিষ্ট্রি করা চাই, তাতে সময় লাগবে। টাকাটা নিয়ে আপাততঃ ইজ্জৎ রক্ষা করুন তো! তারপর পরশু দলিল লেখাপড়া করে দেবেন।

জয়গোপালের দু'চোখ বাষ্পে সজল···নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, বাবা।

নোটের তাড়া জয়গোপালের হাতে বাসু দিলে গুঁজে। মা বললেন—এতখানি যদি করলে বাবা, তাহলে আর একটু···

তাঁর দিকে চেয়ে বাসু বললে—বলুন।

মা বললেন—কাল সকালে তুমি যদি ওঁকে সঙ্গে করে কাছারিতে নিয়ে যাও! নাহলে উনি যা হয়ে আছেন···আমার ভয় করে!

আশ্বাস-ভরা কণ্ঠে বাসু বললে—এ আর বেশী কথা কি! যাবো।···টাকাটা এখন ভালো করে তুলে রাখুন। আমি আসি।

৯

পরের দিন।

সকালে উঠেই মধুকে তাড়া—নাপিত ডেকে আন্···সভ্যভব্য নাপিত।

মধু গেল নাপিতের সন্ধানে—মুখ-হাত ধুয়ে বাসু সন্ধ্যাহ্নিক সেরে উঠেছে। মধু খবর দিলে, নাপিত হাজির।

নীচে রোয়াকে বসে চুল কাটা। নাপিতকে দেখে বাসু খুব খুশী। বেশভূষা দেখলে নাপিত বলে মনে হয় না—বাবু-সাজ। সঙ্গে চুল-কাটার কতরকম যন্ত্র। একখানা দাড়াভাঙ্গা চিরুণি আর লম্বা কাঁচি

নয়, নাপিতের ব্যাগ আছে। সে ব্যাগে ছোট-বড় কত সাইজের ক্লিপ, নানা সাইজের কখানা চিরুণী, আয়না, ক্ষুর, আরো কত কি। নাপিতকে বাসু বলে দিলে, এখনকার যেমন রেয়াজ…ছোট-বড় করে ছেঁটে দেবে।…

নাপিত নানা কায়দা করে চুল ছাঁটছে, বাসু চোখ বুজে আছে! জয়গোপালবাবুর বাড়ীর ছবিখানা মনের পটে জ্বলজ্বল করে উঠলো। বেচারী জয়গোপালবাবু! তাঁর স্ত্রী…চমৎকার মানুষ…স্নেহে ঢল-ঢল! আর চাঁপা মেয়েটি? কলেজে মিসেক্ট-পোয়েম্‌সে সত্ত পড়েছে—

She is a Phantom of Delight.

নোট পড়েও এ লাইনটার মর্ম্ম বোঝেনি! চাঁপাকে দেখে এখন বুঝেছে। বুঝেছে, Sheদের মধ্যে আনন্দের Phantom যদি কখনো কাকেও দেখে থাকে তো সে এই চাঁপা! এমন সময় কাঁচির ক্যাঁচ শব্দে হঠাৎ তার কি মনে হলো…কেমন একটু শিহরণ… একখানা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে চুল কাটতে বসেছে, সেই চাদরখানার কোলের কাছে পড়লো কাটা টিকির গোছা! চমকে বাসু বলে উঠলো—এহে হে হে হে হে…টিকিটা একেবারে সাফ করে দিলে! ছি ছি!

ঈষৎ অপ্রতিভ কণ্ঠে নাপিত দিলে জবাব—আজ্ঞে, আপনি তো বলে দেন নি! তাছাড়া স্যর, এখনকার ষ্টাইলে ইয়ং-ম্যানদের মাথায় টিকি… কেউ রাখে না স্যর!

বাসু বললে—তবু! না, না, খানিকটা রাখলে পারতে…চুলের মধ্যে মিলিয়ে মানে, একটুখানি…বাড়ীতে যাতে বাবা…

নাপিত বললে—ও, তা এক-হপ্তার মধ্যে আবার গজিয়ে উঠবে।… নাপিত ঘাড়ে ক্লিপ চালালো।

দোতলায় ঘড়িতে ঢং-ঢং দুটি আওয়াজ! বাসু শিউরে উঠলো। বললে—ইস্, সাড়ে আটটা! কি সর্ব্বনাশ! ছাড়ো, ছাড়ো···আর থাক্।

নাপিত বললে—আজ্ঞে স্যর, জুল্‌পি দুটো ঘাড়ের সঙ্গে মিলিয়ে···

তাড়া দিয়ে বাসু বললে—চট্‌পট্! চট্‌পট্! আমার কোর্টের তাড়া!

নাপিত কোনো রকমে তার কাজ শেষ করে বাসুকে দিলে ছেড়ে। বাসু উঠে দাঁড়ালো···দাঁড়িয়ে গায়ের চাদরখানা ফেলে ডাকলো—ওরে মধু, আমি নাইতে যাচ্ছি! আমার বেরুবার জামা আর জুতো···চট্ করে নামিয়ে নিয়ে আয়। আর এ নাপিতকে পয়সা···

এ কথা বলে বাসু গিয়ে ঢুকলো স্নানের ঘরে এবং তিন-চার মিনিটের মধ্যে মাথা ধুয়ে সেরে বেরুলো। বেরিয়েই মধুর আনা জামা-কাপড় পরে সিঁড়ির পাশে টুলের উপর বসে পড়লো···বসে জুতায় পা ঢুকিয়ে ফিতে বাঁধা।

নাপিতকে বিদায় করে মধু রান্নাঘরের দিকে যাবে, বাসু বললে—চট্ করে দুটি ভাত···আলু-ভাতে, ঘি আর দুধ···ব্যস্!

—হুঁ। বলে মধু গেল চলে।

ইতিমধ্যে ফটকের সামনে কখন একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে—ট্যাক্সিতে মোটঘাট নিয়ে এক তরুণ-তরুণীর আবির্ভাব, বাড়ীর কেউ টের পায়নি! মোটঘাট ট্যাক্সিতে রেখে তরুণ আর তরুণী এলো ভিতরে···যেখানে বাসু টুলের উপর বসে জুতোর ফিতে বাঁধছে, একেবারে সেইখানে। দুজনকে দেখে বাসু চমকে উঠলো—দিদি! কিরণদা!

অর্থাৎ বাসুর দিদি শচী এবং ভগ্নীপতি কিরণ। কিরণ বললে—হ্যাঁ। মধু কোথায়? গাড়ী থেকে জিনিষপত্রগুলো নিয়ে আসবে।

মধুকে ডাকতে হলো না। ফটকে মধু গাড়ী দেখেছিল—নিজে থেকেই এসে হাজির। কিরণ এবং শচীকে দেখে বড় বড় চোখ করে মধু বললে—দিদিমণি! জামাইবাবু!

শচী বললে—গাড়ী থেকে মালগুলো নামিয়ে নিয়ে আয়।…একটা দশ টাকার নোট মধুর হাতে দিয়ে কিরণ বললে—মিটারে ওর ভাড়া হয়েছে প্রায় আট টাকা। ওকে পুরোপুরি আটটা টাকা দিয়ে ফেরত নেবে দু-টাকা।

টাকা নিয়ে মধু চলে গেল। বাসুর পানে তাকিয়ে কিরণ বললে—এত সকালে সাজগোজ করে কোথায় চলেছিস্?

একটা ঢোক গিলে বাসু বললে—ক্-ক্-কলেজ! মানে, টু-টু-টিউটোরিয়াল ক্লাশ আছে কিনা! কিন্তু তোমরা? খপর না দিয়ে কানপুর থেকে হঠাৎ…

কিরণ বললে—হ্যাঁ। এলুম…কলকাতার হেড-অফিস থেকে জরুরি টেলিগ্রাম পেয়ে। আমাকে শিলং যেতে হবে ইন্‌সপেক্‌শনে। আসবার সময় তোমার দিদি জেদ ধরলে, তোমার এখানে আসবে। কাজেই দুজনের আবির্ভাব! আমি শিলং যাবো…যদ্দিন না ফিরি, তোমার দিদি থাকবে এখানে। তা টিউটোরিয়াল ক্লাশ আবার কি রে? এই সকালে…

অপ্রতিভ-ভঙ্গীতে বাসু বললে—হ্যাঁ। মানে, স্পেশাল টিউটোরিয়াল ক্লাশ হচ্ছে…কলেজে অনেক ছেলে কিনা…তাই মানে, গ্রুপ করে-করে… মানে, সকলের যাতে সুবিধা হয়! অমনি সেই সঙ্গে…

বাধা দিয়ে কিরণ বলে উঠলো—থাম্ শালা! টিউটোরিয়াল ক্লাশ! আমরা কখনো কলেজে পড়িনি, না? বই নেই, খাতাপত্তর নেই… কোথায় আড্ডা মারতে না পিকনিক করতে চলেছেন…আমাদের দেখে বলা হচ্ছে, কলেজ! খোল্ জামা। বলে জোর করে বাসুর গা থেকে তার জামা খুলে নেবার প্রয়াস।

দুমড়ে দুমড়ে বাধা দিয়ে বাসুর প্রতিবাদ—না, না সত্যি! আঃ—কি

করচো কিরণদা? এখনি না গেলে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যাবে!

—হোক্! বলে বাসুর গা থেকে কোটটা কিরণ খুলে নিলে; নিয়ে বললে—টিউটোরিয়াল ক্লাশ হোক্, আর যে-ক্লাশই হোক, তোমার আজ কলেজ যাওয়া হবে না! আমরা এলুম কতদূর থেকে, আর উনি…

কণ্ঠে অনুযোগের সুর…শচী বললে—সত্যি বাসু, কদ্দিন বাদে দেখা… তোর কাছেই আসা! আর তুই বাড়ী থাকবি না?

শচী বললে—আহা, তুমি বুঝছো না দিদি, কলেজে আমার আজ না গেলে নয়! কাল থেকে তুমি দেখো, যতদিন থাকবে, আমি…

বাধা দিয়ে কিরণ বললে—থাম্। জানিস্ তো, ভদ্রলোকের এক-কথা!…আমি যখন বলেছি, আজ তোমার কলেজ যাওয়া হবে না, তখন তুমি কলেজ যেতে পাবে না!…খোল্, জুতো খোল্।

বাসুর মাথার রক্ত উঠছে সোঁ-সোঁ করে, বাসু বেশ তা স্পষ্ট উপলব্ধি করছে। চোখের সামনে ধোঁয়ার কতকগুলো কুণ্ডলী ঘুরপাক খাচ্ছে! সে যেন…হতভম্ব!

হেসে শচী বললে—তোমরা শালা-ভগ্নীপোতে ফষ্টি-নষ্টি করো—আমি আসি। স্নান করতে না পারলে সোয়াস্তি পাবো না। এ-কথা বলে শচী চললো দোতলার দিকে।

বাসু নিরুপায় দৃষ্টিতে কিরণের পানে তাকালো—মিনতিভরা-কণ্ঠে ডাকলো—কিরণদা…

কিরণের হাতে বাসুর জামা…কিরণ বললে—জুতো খুললি? না, আমাকে খুলে দিতে হবে?

কিরণকে বাসু বিলক্ষণ জানে…ভয়ানক জেদী আর গোঁয়ার! যা ধরে, করবেই! যুক্তি-টুক্তির ধার ধারে না।…কিরণের হুমকিতে বাসুকে

জুতো খুলতে হলো। মধু এদিকে সেই উড়ে মালীর সঙ্গে ধরাধরি করে বেডিং আর দুটো সুটকেস এনে ফেলেছে। সেগুলো রোয়াকে জড়ো করে মধু বললে মালীকে—নে, ধরাধরি করে দোতলায়···

মধু আর মালী সুটকেস নিয়ে দোতলায় উঠলো। কিরণের কাঁধে বাসুর কোট, হাতে বাসুর জুতো। বাসু বলে উঠলো—করছো কি কিরণদা, আমার জুতো তুমি হাতে করে···

হেসে কিরণ বললে—শুধু এই নয়···কাঁধে তোমার জামা, বাঁ-হাতে জুতো আর এই ডান হাতে তোমার টিকি ধরে উপরে টেনে নিয়ে যাবো! নাহলে···এ-কথা বলে বাসুর টিকি ধরতে গিয়ে কিরণ দেখে, টিকি নেই! হেসে কিরণ বললে—বাঃ! সাফ! একেবারে পুরোপুরি ক্যালকেশিয়ান্!

মিনতিভরা-কণ্ঠে বাসু জবাব দিলে—এখানকার নাপিত···

কিরণ বললে—যখন বাড়ী যাবি···কর্ত্তার কাছে···

মৃদু হেসে বাসু বললে—তদ্দিনে বোঁটার মতো একটুখানি আর গজিয়ে উঠবে না?

—বহুৎ আচ্ছা! এই তো মানুষ হবার লক্ষণ! আয় উপরে। ধরাচূড়ো খুলে মুখ-হাত ধুয়ে একটু চা···তোকে দুর্ভাবনা করতে হবে না। আমাদের সঙ্গে চা, পট, পেয়ালা সব আছে···তোর দিদি বানিয়ে দেবে।···কল্কাতায় এসে চা খেতে শিখেছিস? না, এখনো গেঁয়ো-খোকার মতো শুধু নাল্‌তে চিরেতা খাস! হা হা হা···

—তুমি এগোও, আমি যাচ্ছি···মানে, সকলের খাওয়া-দাওয়া···

কিরণ দোতলায় উঠবে, সুটকেস রেখে মধু আসছিল নেমে···মধুর হাতে বাসুর জামা আর জুতো দিয়ে কিরণ বললে—তোর দাদাবাবুর এ দুটো দোতলার ঘরে গিয়ে রাখ্ আগে—তার পর বাকি মালপত্তর।

তাই হলো। ধাক্কা দিয়ে বাসুকে যেন অকূল সাগরে ফেলে কিরণ চলে গেছে···বাসু কূল-কিনারা পাচ্ছে না! দোতলার ঘড়িতে টং টং করে নটা খানিক-আগে বেজে গেছে···ওখানে তার প্রত্যাশায় জয়গোপালবাবুরা···আদালতের ব্যাপার! বাসু এই বয়সে আদালতের ব্যাপার কিছু-কিছু বোঝে। ভেবে সে আকুল! জুতো নেই, জামা নেই···দোতলায় গিয়ে জামা-জুতো নেবে, সে উপায়ও নেই! এখন···? চোখের সামনে দিয়ে মধু আর মালী বার-বার যাওয়া-আসা করে লগেজ-পত্র তুলে দেছে···দিয়ে মধু তার সামনে দিয়েই আবার বাজারে ছুটলো। বলে গেল, দিদিমণি আর জামাইবাবুর জন্য ভালোরকম ব্যবস্থা।···পাথরের পুতুলের মতো বাসু দাঁড়িয়ে···সে-কথায় বাসু কোনো কথা বলতে পারলো না! তার মাথা আর বুক ভরে চিন্তার তরঙ্গ···যেতেই হবে! না গেলে ওদিকে মহামুস্কিল! কিন্তু কি করে যায়? জুতো? জামা?

বিধাতা বুঝি সদয় হলেন! বাসু দেখে, সামনে ফটক দিয়ে ধোপা এসে ঢুকলো···ধোপার মাথায় কাচা জামা-কাপড়ের গাঁটরি। ধোপাকে দেখে···যে-মাথায় শুধু ধোঁয়া জমে উঠছিল, সেই মাথায় যেন দপ করে আলো জ্বললো! ধোপা এলো নীচেকার দালানে···খুব চাপা গলায় বাসু বললে ধোপাকে···এই, এই, এইখানে নামা তোর গাঁটরি, নাগিয়ে চট্ করে খোল্···

যার হাত থেকে টাকা পায়, তার কথা অমান্য করতে পারে না! ধোপা গাঁটরি নামিয়ে গ্রন্থি খুললো। গাঁটরির দিকে ঝুঁকে বাসু বললে ধোপাকে—দে, দে চট্ ক র আমার একটা জামা বার করে। শুধু জামা··· একটা জামা!

পাট তুলতে তুলতে সামনেই যে-জামা, সেটা টেনে নিয়ে বাসু বললে—এইটেতেই হবে। থাক্,···তুই গাঁটরি বন্ধ কর্! এটা আমি···

ধোপা বললে—কিন্তু গুন্‌তি মেলানো…

—ঠিক আছে। মধুকে বলবি, বাবু একটা জামা নিয়েছে।

ধোপা গাঁটরি বাঁধতে লাগলো। বাসুর হাতে জামা…কোট…পাট খুলে গায়ে দেবে, উপর থেকে দিদির কণ্ঠ—তোমার হাত-ব্যাগটা খুলে সাবানখানা দাও না গো।…এ-কথার উত্তরে কিরণের কণ্ঠ—একটু সবুর করো…চায়ের সরঞ্জাম বার করেছি…কেটলিটা মধুকে দিয়ে…

বাসু চমকে উঠলো! এই রে, কিরণদা এখনি তাহলে নেমে আসবে! তার আগেই…

কোট আর গায়ে দেওয়া হলো না, বগলদাবা করে পা টিপে-টিপে খুব হুঁশিয়ার হয়ে বাসু এগুতে লাগলো…পায়ে জুতো নেই, ভুলে গেছে! কোনোমতে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে চোরের মতো নিঃশব্দে বাসু বেরিয়ে গেল।

জয়গোপালের বাড়ীর সকলে আকুলভাবে বাসুর পথ চেয়ে। মা বললেন—তাই তো, ছেলেটি এখনো এলো না! বরানগর থেকে আলিপুর…পৌঁছুতে যদি দেরী হয়? নিশ্চয় কোনো একটা…আমি বলি, তুমি তাহলে…

কণ্ঠে উদ্বেগ…জয়গোপাল বললেন—আর পাঁচ-মিনিট দেখি।

চাঁপা সতৃষ্ণ নয়নে সদরের পানে চেয়ে আছে…ঠাকুরকে প্রাণপণে ডাকছে—হে ঠাকুর, এনে দাও, তাঁকে এনে দাও…

ছুটতে ছুটতে বাসু বাড়ী ঢুকলো। ঢুকে তিনজনকে তদবস্থ দেখে ঈষৎ অপ্রতিভ! বুঝলো, বাসুর দেরী দেখেই…বাসু বললে—হেঁ-হেঁ দেরী হয়ে গেল। মানে, হ্যাঁ, চলুন, বেরিয়ে পড়ি।

মায়ের মুখে হাসি ফুটলো। তিনি বললেন—বাঁচলুম, বাবা। তোমার দেরী দেখে ভাবনা হচ্ছিল, বাবার কোনো অসুখ-বিসুখ···

বাধা দিয়ে বাসু বললে—আজ্ঞে না, অসুখ-বিসুখ নয়! তবে···মানে··· তা একখানা ট্যাক্সি নেবো, তাহলে আর কতক্ষণ!

বাসুর গায়ে ফতুয়া, ফতুয়ার উপরে সার্ট বা কোট নেই, পায়ে নেই জুতো! সেদিকে বাসুর কিছুমাত্র খেয়াল নেই! কিন্তু এঁরা বাসুর এ-বেশ দেখে স্তম্ভিত! জয়গোপালবাবু বললেন—কিন্তু বাবা, এরকম বেশে!

বাসুর হুঁশ হলো। ইস্, তাই তো! সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—ও···হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখুন না, এই জন্যই তো দেরী! চাকরটা গেছে বাজারে···তার কাছে আলমারির চাবি। বাজার থেকে কিছুতেই আর ফেরে না! অথচ জামার জন্য···তাই দেখুন না, এই কোটটা ছিল পাট-করা বিছানার উপর! শেষে এইটে টেনে নিয়ে! হেঁ-হেঁ তাড়াতাড়িতে গায়ে দেবার সময় পাই নি!···বলতে-বলতে কোটটা খুলে বাসু গায়ে দিলে; গায়ে দিয়ে বললে—নিন, এইবার আসুন। আমি রেডি।

এ-মানুষটির সব কেমন অদ্ভুত···চাঁপার যেমন মজা লাগছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মানুষটির উপর কেমন একটু মমতা! অর্থাৎ বাসুকে চাঁপার ভারী ভালো লাগছে! এমন মানুষ আগে সে আর কখনো দেখে নি! সে চুপ করে থাকতে পারলো না·· মৃদু হেসে বললে—কিন্তু আপনার জুতো?

পায়ে জুতো নেই, বাসুর খেয়াল ছিল না। চাঁপার কথায় খেয়াল হলো! সে অপ্রতিভ···বলতে পারে না, কী করে পায়ের জুতো জোড়া···অথচ একটা জবাব! চট্ করে মাথায় একটা আইডিয়া!

বাসু বললে—হ্যাঁ, জুতো!…কি জানেন…মানে, এই যে, এখানটায়… বলে ডান-পায়ের গোড়ালি ধরে পা তুলে বললে—জুতোয় এমন একটা পেরেক উঠেছে…হেঁ-হেঁ…

মা বলে উঠলেন—তা বলে বাবা, এই শুধু-পায়ে…

বাসু দিলে জবাব—আজ্ঞে, তার জন্য কিছু এসে যাবে না। খালি পায়ে চলা আমার অভ্যাস আছে—পাড়াগাঁয়ে থাকি তো!…তা আর দেরী নয়, চলে আসুন…পথে আবার ট্যাক্সি ধরতে হবে।

এ-কথা বলে জয়গোপালকে নিয়ে ব্যস্তভাবে বাসুর নিষ্ক্রমণ। মা আর চাঁপা ওঁদের পানে চেয়ে…মায়ের চোখে করুণ ছলছল ভাব… চাঁপার চোখের দৃষ্টি জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে!

ও-বাড়ীতে বিপর্য্যয়! জিনিষপত্র গুছিয়ে চা খেয়ে বাসুর সন্ধান। …সন্ধান মিললো না। কিরণ বললে—বেরিয়ে গেল তাহলে! কিন্তু জামা? জুতো?

মধু বললে—ধোপাকে দিয়ে গাঁটরি খুলিয়ে একটা জামা নিয়ে গেছেন।

কিরণ শুধু বললে—হুঁ। শচী কোনো কথা বললে না…তার মনে অভিমানের একটু দোলা! তারপর অবকাশ নেই…কিরণকে নেয়ে খেয়ে এখনি বেরুতে হবে…কলকাতায় লালদীঘির ধারে তার হেড অফিস, সেইখানে। মধু আর রঘু মিলে চট্‌পট্‌ উদ্যোগ-আয়োজন করলে! খেয়েদেয়ে কিরণ বেরিয়ে গেল। বাড়ীতে শচী একা। সে স্নান করে খেয়ে গোছগাছ করতে লাগলো, ভাবলো, ভাই না খেয়ে কলেজে গেছে…অতএব ফিরতে তেমন দেরী হবে না! একটা-দু'টোর মধ্যেই সে ফিরবে!

কিন্তু…

১০

সন্ধ্যার একটু আগে।

বাসু এখনো বাড়ী ফেরে নি।...শচীর মনে সেজন্য বেশ দুশ্চিন্তা! কিন্তু বাসুর কলেজের ব্যাপার সে জানে না—তাই মনকে বার-বার সান্ত্বনা দিচ্ছে, কলেজে হয়তো...

কিরণ ফিরলো। ফিরেই শচীকে প্রশ্ন—বাসু?

উদ্গত নিশ্বাস চেপে শচী বললে—তার কোনো পাত্তা নেই সেই থেকে।

টাই-কোট খুলতে খুলতে কিরণ বললে—কলেজে যায় নি মোদ্দা। অফিসের পথে ওর কলেজে একটা ঢুঁ মেরে গিয়েছিলুম। শুনলুম, মহাপ্রভু কলেজে যান নি! তাছাড়া জামা-জুতো কেড়ে রাখলুম...অত পীড়াপীড়ি...তবু বেরিয়ে গেল! তাও বলে নয়, জানিয়ে নয়...চোরের মতন!

শচী বললে—গেল কোথা? সারাদিন...না খেয়ে না দেয়ে...

মধু এলো...তার হাতে সরবতের গেলাস...

কিরণ বললে মধুকে—হ্যাঁ মধু, তোমার দাদাবাবু এখানে কোথাও আড্ডাটাড্ডা জুটিয়েছে নাকি...তাসের, কি গানের, কি কুস্তির আখড়া?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে মধুর চিন্তা...তার ভ্রূ কুঞ্চিত! মধু বললে—কুস্তি!...রসুন...রসুন...হুঁ!...এই কাছেই একজনদের বাড়ী... কাল দেখি, সেই বাড়ীর উঠোনে একজনের সঙ্গে দাদাবাবু ভয়ানক কোস্তাকুস্তি জমিয়েছে!

শচী চমকে উঠলো। বললে—কোস্তাকুস্তি?

মধু দিলে জবাব—হ্যাঁ গো দিদিমণি, সে একেবারে কুরুক্ষেত্তর!

কিরণ বললে—সেই বাড়ীতেই কি তাহলে? আমাকে নিয়ে যাবে মধু?

মধু বললে—কেন যাবো না?

শচী বললে—আমিও যাবো তোমার সঙ্গে। সত্যই সেখানে? কিন্তু তার আগে তুমি খেয়ে নাও জলখাবার আর চা।

দৃশ্যান্তর···অর্থাৎ এখানে জয়গোপালের গৃহে···

যেন উৎসব! এত-বড় বিপদে উদ্ধার করতে কেউ যদি পারেন তো নারায়ণ! মায়ের কেবলি মনে হচ্ছে, বড় কাতর হয়ে এতকাল ঠাকুর-দেবতার চরণে কত আকুতি জানিয়েছেন···কত প্রার্থনা··· কোনোদিন আভাসে মুক্তির এতটুকু ইঙ্গিত মেলেনি! শেষে মেয়েকে নিয়ে যখন হতভাগার অত-বড় অভিসন্ধি···মায়ের মনে পড়ছিল মহাভারতের কুরুসভায় কৌরবদের হাতে লাঞ্ছিতা পাঞ্চালীর কথা! বীর পঞ্চ-স্বামী সভায় বসে···অসহায়, নিরুপায়! পাঞ্চালী প্রাণের আকুতি জানিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চালীকে সে-বিপদে কি করেই না···

মায়ের কেবলি মনে হচ্ছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণ যেন আজ তাদের প্রাণের আকুল প্রার্থনায় দুঃখে বিগলিত হয়ে কোদাল-হাতে এই ছেলেটির মূর্ত্তি ধরে এসে দারুণ দায়ে···সবচেয়ে বড় অপমান-লাঞ্ছনার হাত থেকে পরিত্রাণ করেছেন! আর চাঁপা? মায়ের কথা মনে পড়ছে! মা বলছিল—তুই পাগল হয়েছিস চাঁপা, ছদ্মবেশে রাজার কুমার এসে··· চাঁপার কেবলি মনে হচ্ছে, রাজার কুমার···রাজার কুমার!

মায়ের যেমন সামর্থ্য, এ-নারায়ণকে কৃতজ্ঞ অন্তরে যতখানি দিতে পারেন! নিজের হাতে মা সারাদিন ধরে তৈরী করেছেন চন্দ্রপুলি··· ক্ষীরের ছাঁচ···মালপো···এমনি পাঁচ-রকম খাবার। চাঁপা তাঁর সঙ্গে

সঙ্গে ছায়ার মতো···চাঁপার বুকের ভিতরটা আলোয় আলো হয়ে আছে! থেকে থেকে সে কেমন অপ্রতিভ হচ্ছে, চমকে উঠছে! ছি-ছি, ধাঙড় মনে করে ওঁকে কী না বলেছে! চাঁপার কান্না দেখে উনি যখন দরদ-ভরে···

এখন জয়গোপালের গৃহে বাসু যেন দিগ্বিজয়ী বীর! বাসু আদালতের কাজ চুকিয়ে জয়গোপালের সঙ্গে সোজা এখানে এসে উঠেছে, বাড়ী যায়নি! বাড়ীর কথা মনে নেই! বাড়ীতে দিদি আর কিরণদা এসেছে, আনন্দের উত্তেজনায় সে-কথা বাসু একেবারে ভুলে গেছে।

বাড়ী ফিরে মুখ-হাত ধুয়ে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে জয়গোপাল বেরিয়ে গেছেন কাছেই কাশীপুরে···তাঁর জানা ভালো উকিল আছেন নৃপেনবাবু—সেই নৃপেনবাবুর কাছে।—অর্থাৎ যত তাড়াতাড়ি পারেন, কাছারি থেকে বন্ধকী-মামলায় দাখিল-করা বাড়ীর দলিলপত্র উদ্ধার করে এনে এই বারোশো টাকার জন্য বাসুদেবের নামে নতুন বন্ধকী-খত লিখে রেজিষ্ট্রী করে দেওয়া। সেটুকু না-করা-ইস্তক তাঁর মাথা থেকে বোঝা নামবে না! মা বসে বাসুকে যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন। রোয়াকে আসন পাতা—আসনে বসে বাসু খাচ্ছে। খেতে খেতে তার মুখে দেওয়ালির বাজির মতো ফুটছে কাছারির কথা—বিরিঞ্চি-উল্লুকটা মহাভারতের শকুনির মতো কুৎকুতে চোখে কেমন করে তাকাচ্ছিল, হাতে মালা জড়ানো, বিড়বিড় করে তার সেই হরেকেষ্ট-জপ···তার চোখের সামনে দিয়ে তারা গিয়ে উকিলের মারফৎ টাকা জমা করে দিলে। তার পর নিলামের জায়গায় বিরিঞ্চি যখন···হা-হা-হা···পেয়াদা গিয়ে হাকিমের সহি-করা হুকুম দিলে···নিলাম বন্ধ···তখন ও যেন হন্যে-কুকুর! বাসুর পানে এমন ভাবে তাকালো···যেন একটি

কামড়ে বাসুর টুঁটি দেবে ছিঁড়ে! তার চোখের সামনে দুটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বাসু বললে—নবডঙ্কা!…

বলতে বলতে উত্তেজনায় বিষম লাগলো বাসুর…মা বললেন—শীগ্‌গির জল খাও, বাবা।

জল খেয়ে বাসু প্রকৃতিস্থ হলো। চাঁপার দু'চোখে হাসির ঝিলিক… বাসুর সামনে বসে চাঁপা তাকে পাখার বাতাস করছে…চাঁপা বললে—তার পর?

বাসু বললে—তার পর…ওঃ, সে যা হলো…

সত্যই এর পর যা হলো, যেন বিনা-মেঘে বজ্রপাত! অর্থাৎ এই নাটকীয় মুহূর্ত্তে সদর দিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে শচী, কিরণ এবং তাদের গাইড মধু। কিরণ আর শচী নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে রোয়াকের খুব কাছে। মা, চাঁপা আর বাসু এই অপ্রত্যাশিত বিজয়-বিবরণে এমন তন্ময়, ওদিকে নজর পড়েনি—নজর পড়লো কিরণের মৃদু আহ্বানে। কিরণ ডাকলো—বাসু…

এ-ডাকে যেন বিদ্যুতের প্রবাহ! চমকে বাসু তাকালো সেই কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে। দেখে, কিরণ আর শচী! পরক্ষণেই সে তাকালো মায়ের দিকে, চাঁপার দিকে। তাঁরা যেন ভূত দেখেছেন, এমনি তাঁদের মুখের ভাব!

বাসু আবার তাকালো দিদির দিকে—কিরণের দিকে—বললে—তোমরা…হঠাৎ!…বলেই এঁদের দিকে ফিরে বাসু জানালো পরিচয়,—আমার দিদি! আর ইনি ভগ্নীপতি কিরণদা!

—ও! মা তখনি উঠে দাঁড়ালেন…তাঁর পিছনে হাতের পাখা ফেলে চাঁপা উঠে দাঁড়ালো। বাসু উঠতে যাচ্ছিল, পারলো না। তার পা দুটো কে যেন পেরেক দিয়ে এঁটে দেছে!

মা এগিয়ে এসে শচীর হাত ধরলেন, সস্নেহে বললেন—এসো মা, এসো…তারপর কিরণের দিকে চেয়ে—এসো বাবা! তারপর চাঁপার দিকে চেয়ে মা বললেন—ওমা চাঁপা, শীগ্‌গির একখানা সতরঞ্চি এনে এখানে পেতে দে।

চাঁপা ছুটলো ঘরে সতরঞ্চি আনতে; এবং তখনি সতরঞ্চি এনে রোয়াকে বিছিয়ে দিলে। শচীর হাত ধরে মা সেই সতরঞ্চিতে বসালেন—তারপর কিরণের দিকে চেয়ে বললেন—উঠে এসো বাবা, তুমি এই তক্তাপোষে…

কিরণ বললে—আপনি ব্যস্ত হবেন না! ঠিক আছে,আমি এইখানেই…

এ কথা বলে কিরণ তাকালো বাসুর দিকে—বাসু ইতিমধ্যে আসন ছেড়ে উঠে রোয়াকের একধারে পা ঝুলিয়ে বসেছে…কিরণ বসে পড়লো রোয়াকে বাসুর পাশে—মৃদুকণ্ঠে বাসুকে বললে—কি ব্রাদার, এই তোমার কলেজ? টিউটোরিয়াল ক্লাশ? আর (দৃষ্টিতে চাঁপাকে ইঙ্গিত করে) ঐ টিউটর?

লজ্জায় বাসু এতটুকু! কিরণকে কনুইয়ের মৃদু গুঁতো দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বাসু বললে—আঃ! কী যা-তা ইয়ার্কি!

হেসে অস্ফুট কণ্ঠে কিরণ বললে—বুঝেছি, ব্রাদার! Love at first sight!

দু'চোখে ভর্ৎসনা ভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করে ওঁদের অলক্ষ্যে বাসু বললে—আঃ!

শচী ও-দিকে চাঁপার হাত ধরে চাঁপাকে পাশে বসিয়েছে; বসিয়ে চাঁপাকে দেখছে দু'চোখের দৃষ্টি উজাড় করে—দেখে দেখে মায়ের পানে তাকিয়ে শচীর প্রশ্ন—মেয়ে?

মা বললেন—হ্যাঁ!

তারপর ঘটনার ছোটখাট কতকগুলো টুক্‌রো। গুলির ছর্‌রা যেমন চক্ষের পলকে ঝরঝর করে ঝরে পড়ে, তেমনি এই টুকরোগুলোয় ঘটনার গতি। অর্থাৎ…

বাসু তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো…উঠেই রোয়াকে দু'এক পা সঞ্চরণ! মা বললেন—ও-কি বাবা, কোথায় যাচ্ছো?

বাসুর বুকখানা ছাঁৎ করে উঠলো! বাসু ভাবলো, এই রে! মায়ের দিকে চেয়ে স্খলিত কণ্ঠে বাসু বললে—আজ্ঞে না, যাইনি তো।… মানে…এই…এই…হ্যাঁ, হাতটা ধোবো।

মা তাকালেন চাঁপার দিকে, বললেন—ওমা চাঁপা, বাবার হাতে জল দে।

সলজ্জ-ভঙ্গীতে চাঁপা উঠে দাঁড়ালো—তারপর বাসুর দিকে এলো। বাসু ততক্ষণে রোয়াকের কোণে বালতি ভরা জল আর বড় ঘটি ছিল, সেখানে এসেছে; এসে জলের ঘটি তুলে মাকে উদ্দেশ করে বললে—না, না, আমি নিজেই নিচ্ছি…

চাঁপা এসে ঘটি নিতে হাত বাড়ালো। চাঁপার দিকে চেয়ে বাসু বলে উঠলো—না, তুমি যাও…মানে, হেঁ-হেঁ আপনাকে কিছু করতে হবে না…আপনি যান।

বাসু হাত ধুতে লাগলো—চাঁপা সেইখানে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। শচী বলছিল মাকে—ভারী খুশী হলুম দেখে। বাড়ী ছেড়ে বাসু বাইরে কোথাও একলা থাকে নি কখনো। এখানে বিদেশে আপনাদের এত স্নেহ ভালোবাসা…

বাধা দিয়ে মা বললেন—ওমা, ও-কথা বলো না! বাসুদেব আমাদের যা করেছেন, নারায়ণ জানেন! ওঁর সে ঋণ কোনো জন্মে আমরা শোধ দিতে পারবো না।

দুচোখে প্রচণ্ড বিস্ময়···শচী তাকালো মায়ের দিকে।

মা বললেন—তোমাদের বলতে বাধা নেই মা, দেনার দায়ে এ-বাড়ী আজ নিলেমে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল···বাবা টাকা দিয়ে রক্ষা করেছেন!···পেটের ছেলে এমন করে না, মা!

কথাটা বাসুর কানে গেল—বাসু কোনোদিকে তাকালো না। হাত ধুচ্ছে তো ধুচ্ছেই! হাত ধোয়া আর শেষ হয় না! চাঁপা তেমনি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে! মায়ের কথা শুনে শচী এবং কিরণ···দুজনে তাকিয়ে আছে বাসুর দিকে···চাঁপাকেও সেই সঙ্গে লক্ষ্য করছে দুজনে! কিরণ আর শচী···দুজনে চোখোচোখি···দুজনের চোখে চোখে চকিতে কী যেন ইঙ্গিত!···পর্দ্দার সচল ছবি হঠাৎ যেন চলা বন্ধ করে থমকে থেমে গেছে!

মা প্রথমে কথা কইলেন। মা বললেন—তোমরা এইখানেই থাকো?

শচীর সম্বিৎ ফিরলো। মায়ের দিকে চেয়ে শচী বললে—না। আমরা কানপুরে থাকি, আজ সকালে এসেছি।

মা একটু বিস্ময়বোধ করলেন! বললেন—কিন্তু বাসুদেব তো তোমাদের আসার কথা বলেন নি মা!

বাসুর বুক ছমছমিয়ে উঠলো! এ-কথার পিঠে পাছে আর পাঁচটা কথা এসে পড়ে, তাই সে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—ও···না··· আজ্ঞে, আ···আ—আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম। তা··· মানে, আচ্ছা···দেখুন, আমি তাহলে আসি এখন।···আপনারা কথাবার্ত্তা কন্। আ-আ-আমি···আমি···বলেই লাফ দিয়ে বাসু রোয়াক থেকে উঠোনে নামলো!

মা বললেন—সে কি বাবা, এঁরা এলেন, আর তুমি···

বাসুর চোখের সামনে যেন মরুভূমি খাঁ-খাঁ করছে! একটা ঢোক

গিলে বাসু বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, ওঁরা থাকুন। আমি আ-আ-আবার আসবো। মানে, এই চানটা করেই···

হেসে শচী বলল—সে কি রে? এই এত খেয়ে-দেয়ে তারপর চান?

বাসু বলে উঠলো—তাতে কি! খেয়েছি বলে চান করবো না? তারপর মাথায় হাত দিয়ে সে বললে—সকালে চুল কেটেছিলুম··· তাড়াতাড়িতে চানটা তেমন জুৎসই···

হাসতে হাসতে কিরণ বললে—সে তো বুঝতেই পারছি! টিকি ছেঁটে মাথা তোমার···

এ-সব কথা বাসু কানে তুলছে না! দুচোখে সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে উঠোনে রোয়াকের ধারে কি খুঁজছে! দেখে মা বললেন—কি খুঁজচো বাবা? কিছু হারিয়েছে?

মায়ের দিকে না চেয়ে তেমনি কি-খুঁজতে-খুঁজতেই বাসু বললে—আজ্ঞে হাঁ, মানে, আমার জুতো!

মা চমকে উঠলেন! বললেন—জুতো!

কিরণ এবং শচী বলে উঠলো—জুতো!

চাঁপা ঠায় কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে—বাসুর এ-কথায় যেন প্রাণ পেলো! প্রাণ পেয়ে চাঁপার ঠোঁটে হাসির রেখা! কৌতুকের স্বরে চাঁপা বললে—কিন্তু জুতো আপনি পায়ে দিয়ে আসেন নি সেই তো···খালি-পায়ে এসেছিলেন।

বাসুর খেয়াল হলো! ঠিক!···অপ্রতিভভাবে বাসু বললে—ও, পায়ে ফোস্কা···

চাঁপা বললে—ফোস্কা! কিন্তু আপনি যে বললেন, জুতোয় পেরেক উঠেছে!

বাসু আরো অপ্রতিভ! মাথা আর তুলতে পারে না! ঘেমে

উঠলো। কোনোমতে সে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন, পেরেক! পেরেক! খুব মনে করিয়ে দেছেন আপনি! আচ্ছা, আমি তাহলে আসি।

বলেই শশব্যস্তে বাসুর প্রস্থান।

সকলে হেসে উঠলেন! হাসতে হাসতে কিরণ উঠে দাঁড়ালো—বাসুর দিকে চেয়ে—ওরে বাসু, বাসু···বলতে বলতে কিরণও গেল বেরিয়ে।

রাত্রে বাসুকে নিয়ে বাড়ীতে কিরণের তামাসার খোঁচা—প্রেম! প্রেম! কলকাতায় এসে গ্রাণ্ড লেশন্! বাসু তিড়বিড়িয়ে প্রতিবাদ তোলে—যাও, যত বদ্ রসিকতা! ভদ্রলোকের মেয়ে! হেসে কিরণ বলে—আরে, ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গেই তো ভদ্রলোকের প্রেম হয়! নাটক-নভেল পড়িস না? শচীর মনে নানা কথা···বাসুর দিকে চেয়ে ভাবে, বাসু নেহাৎ ছেলেমানুষ—নাটক-নভেল কখানাই বা পড়েছে! প্রেম? না, না।···কিরণকে সে বলে—থামো, আমার ভাই তোমাদের মতো এঁচোড়ে পাকেনি যে প্রেমে পড়বে! প্রেম··· প্রেম···ও-তত্ত্ব ও বোঝে না!

১১

পরের দিন···বৃহস্পতিবার। রাধানগরে মথুরামোহন এবং বাচস্পতির বেশ বিচলিত ভাব। মধ্যাহ্নে আহারাদির পর কলকাতা থেকে এটর্ণি বংশগোপালের লেখা এক চিঠি। পড়ে বাচস্পতিকে তখনি মথুরামোহন ডাকিয়ে এনেছেন। বাচস্পতি এলে তাঁর হাতে বংশগোপালের সেই চিঠি দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে মথুরামোহন বললেন—পড়ো।

বাচস্পতি চিঠি পড়লেন···একবার নয়···দুবার···তিনবার। পড়ে তিনি মথুরামোহনের দিকে তাকালেন। মথুরামোহন একাগ্র দৃষ্টিতে বাচস্পতির দিকে চেয়ে আছেন। চিঠি পড়া শেষ হলে তিনি বাচস্পতিকে বললেন—বংশগোপালের চিঠি···পড়লে?

চিঠিখানা বাচস্পতির বুকে বেশ ঢেউয়ের দোলা দেছে! নিশ্বাস ফেলে কর্ত্তার দিকে চেয়ে বাচস্পতি দিলেন ছোট্ট জবাব—হুঁ।

কর্ত্তা খুব বড় একটা নিশ্বাস ফেললেন; ফেলে বললেন—বাসুদেব হঠাৎ কেন বংশগোপালের কাছ থেকে এই বারোশো টাকা নিলে··· এর মানে?···

মানেটা বাচস্পতি কিছুতে বুঝতে পারছেন না! নিরুত্তরে তিনি কর্ত্তার পানে চেয়ে রইলেন।

মথুরামোহন বললেন—এখনো ছ'মাস হয়নি, বাসু কলকাতায় পড়তে গেছে···এর মধ্যে কোথা থেকে কে এই দুঃখী গরীব জুটলো, যার মান-ইজ্জতের জন্য বাসুর এমন মাথাব্যথা! আমাকে ঘুণাক্ষরে কিছু না জানিয়ে বংশগোপালের কাছে গিয়ে এত টাকা···বলতে বলতে তাঁর বুকখানা ধ্বক্ করে উঠলো···নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যাবে! বুকে হাত চেপে তিনি দু'চোখ বুজলেন, বুজে দু'সেকেণ্ড একেবারে নিস্পন্দ! তার পর চোখ খুলে···কাছে ছিল বটা, বটার দিকে চেয়ে আর্ত্তকণ্ঠে বললেন—সেই লাল বড়ি···ওঃ! বলেই আবার বুকে হাত চাপলেন।

যথারীতি বড়ি দেবার কাজে বটার আশ্চর্য্য পটুতা! কাঁধে ঝুলোনো ব্যাগ থেকে দশ-বারোটা বড়ির কৌটো বার করে তখনি ঠিক কৌটোটি বেছে তা থেকে একটি বড়ি তুলে সে মনিবের হাতে দিলে—দিয়েই খপ্ করে কৌটোগুলো ব্যাগে ফেলে কোণে পাথরের টেবিল থেকে দুধের

বাটি ধরলো মনিবের হাতে···বড়িটি গলায় ফেলে মথুরামোহন দুধটুকু খেলেন ; খেয়ে আঃ বলে আরামের নিশ্বাস ! তার পর দুধের বাটি বটার হাতে দিয়ে সামনে-রাখা ভিজা গামছা তুলে মুখ মুছলেন ; মুছে বাচস্পতির দিকে তাকিয়ে বললেন—এ আমি ভালো বুঝছি না, বাচস্পতি—এর মধ্যে গূঢ় রহস্য আছে !

বাচস্পতি ভাবছেন আর ভাবছেন—কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছেন না ! কর্ত্তার কথায় চমকে তিনি বললেন—রহস্য ?

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে মাথা নেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে মথুরামোহন বললেন—হুঁ। তার পর অত্যন্ত বিচলিত ভাব। নিশ্বাস ফেলে আবার তিনি বললেন—হতভম্বের ভঙ্গী···বললেন—এই জন্যই কলকাতায় পাঠাতে আমার আপত্তি ! এখন এর বিহিত ?

বাচস্পতির একাগ্র দৃষ্টি মথুরামোহনের মুখে নিবদ্ধ। তিনি বললেন—আপনি কি বলেন ?

চিন্তিতভাবে মথুরামোহন বললেন—কালই তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাও। গিয়ে ভালো করে সন্ধান···না না, তুমি একা না, আমিও যাবো—কালই তুমি আমি দুজনে একসঙ্গে কলকাতায়।

বাচস্পতি বেশ চিন্তিত। তাই তো। হঠাৎ বায়ু কার জন্য এমন···কর্ত্তা যদি কোনোরকম···তাই কর্ত্তা যাতে না যান, এই উদ্দেশ্যে বাচস্পতি বললেন—বেশ। কিন্তু কাল কি করে যাওয়া হবে ? কাল আপনার কবিরাজ মশায়ের আসবার দিন।

মথুরামোহনের মনে ছিল না, বাচস্পতির কথায় মনে পড়লো। তাই তো, নিরুপায় ! তিনি বললেন—খুব মনে করিয়ে দেছো ! আমার সেই অম্বলের ব্যথাটা···না ?···মুস্কিল হতো ! তা বেশ, কবিরেজ কাল

ব্যবস্থা করে যাক, তারপর পরশু! এর আর একটি দিন দেরী করা নয়! আমি নিজে সেখানে গিয়ে···

বাচস্পতি দিলেন ত্বরিত জবাব—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

•

ওখানে দক্ষিণেশ্বর। সকালে স্নানাহার সেরে বাসু বেরুলো কলেজে—কিরণ তার হেড অফিসে। অফিসে কাগজপত্র দেখে যথারীতি নির্দেশ নিয়ে তাকে যেতে হবে শিলং—এবং যত চটপট সম্ভব। শচীর আরাম, একা থাকতে হবে না! খাওয়া-দাওয়া সেরে সে গেল জয়গোপালের বাড়ী—সেখানে মা আর মেয়ের সঙ্গে কত কথা। শচীকে মায়ের মনে হলো, যেন পেটের মেয়ে! শচী বড় ভালো! কেন হবে না? ঐ ভাইয়েরই দিদি তো! চাঁপাকেও শচীর খুব ভালো লাগছে। চমৎকার মেয়েটি! গাঁয়ের মেয়ে শচী অনেক দেখেছে। কেউ যেন লজ্জায় জড়োসড়ো—ঘরকন্নার কাজ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো খবর জানে না—জানবার মতো মনও নয়! কোনো মেয়ে এঁচোড়ে পাকা—ছোট-বয়সে এমন পাকা পাকা কথা বলে···গায়ে যেন বিষ ছড়ায়! আবার কেউ-বা···মনে হিংসার জঞ্জাল জড়ো করে আছে···পরের গহনা কাপড়, পরের ভালো দেখতে পারে না! চাঁপা কিন্তু ঘরের কাজে যেমন পটু, ওর মনও তেমনি মায়া-মমতায় ভরা! তার উপর লেখাপড়া জানে। এই বয়সে দুঃখ আর বিপদের কী ঝড় বয়ে গেছে তার মাথায়—সে-ঝড়ে নুয়ে ভেঙ্গে যায়নি! নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে! শুধু বাঁচানো নয়, মন এমন তাজা, এমন চিকণ···দেখলে মনে হয় না··· অত ঝড় সয়েছে! এঁদের বিপদের সব কথা মায়ের মুখে শুনেছে। জয়গোপালবাবুর দুটি মেয়ে—অবস্থা মন্দ ছিল না। কলকাতার কোন্ অফিসে চাকরি ছিল—শ'-দেড়েক টাকা মাহিনা। দুই মেয়ে। বড় ছিল

বকুল, আর ছোট এই চাঁপা। হঠাৎ জয়গোপালবাবুর হলো বাতের অসুখ। একটি বছর শয্যাগত। অফিস কত ছুটি দেবে? চাকরি গেল··· সেই সঙ্গে হাতের যা-কিছু সঞ্চয়···রোগের চিকিৎসায়। অসুখ সেরে কোনোমতে খাড়া হলেন কিন্তু পেট চলে না! তার উপর বড় মেয়ে বকুলের বয়স প্রায় কুড়ি। বিয়ে দিতে হবে! সঙ্গতি নেই। তখন মেয়ের মুখ চেয়ে এই বাড়ী বাঁধা দিয়ে তিন হাজার টাকা ধার নেন বিরিঞ্চি গোঁসাইয়ের কাছ থেকে! ভাত-কাপড়ের সংস্থানের জন্য পেনি-সিরিজের দু-একটা নভেল কিনে মাসে দু'খানা করে তার বাংলা তর্জ্জমা তুলে দেন কসাইটোলার পাবলিশারদের হাতে। তারা নেয় প্রত্যেকটির কপিরাইট কিনে—কখনো নগদ আশি টাকা, কখনো বা একশো টাকা দিয়ে। এ-ছাড়া বাংলা কখানা দৈনিক কাগজে রবিবারের বিশেষ সাহিত্য পৃষ্ঠার জন্য দু'কলম, তিন-কলম করে নিয়মিত লেখা দেওয়া—পাঁচ-রকমের ইংরাজী বই থেকে, ম্যাগাজিন থেকে তর্জ্জমা করেন। মনে বরাবর আশা, কিছু-কিছু করে মাসিক কিস্তি দিয়ে বন্ধকী-দায় থেকে বাড়ীটি করবেন উদ্ধার। কিন্তু এমন বরাত, বিয়ের পর পাঁচ মাস যেতে না যেতে বকুলের সন্তান-সম্ভাবনা এবং তার দু-একমাসের মধ্যে কলতলায় পড়ে গিয়ে···নানা উপসর্গে জড়িয়ে বকুলের সব শেষ! এ ব্যাপারে সকলে এমন ভেঙ্গে পড়লেন যে পৃথিবীতে আর কোনো কিছুর আশা নয়—কোনো মতে দিনপাত। এ বরাত নিয়ে চাঁপার ভবিষ্যৎ রচনা! নিশ্বাস ফেলে মা বলেন—আমার মনে হয়, মেয়ে নয়, কর্পূর···ইনিও কখন ফশ্ করে উবে যাবেন! কিন্তু আমাদের দুঃখ-কষ্ট সীমাহীন হলেও পৃথিবীতে যারা বাস করছে, টাকা-পয়সার মর্ম্ম জানে, তারা তো চুপ করে থাকতে পারে না। জয়গোপালবাবুর মনের অবস্থা এমন হলো, লেখায় মন নেই—কাগজ-কলম নিয়ে বসেন; কলমে

লেখা সরে না! খবরের কাগজে জোগান চাই ঠিক সময়ে…সেখানে ক'বার লেখা দিতে পারলেন না—সে কাজ গেল।

কিন্তু প্রাণগুলো দেহে যতক্ষণ আছে, খেতে হবে, পরতে হবে! শুধু ঐ ইংরেজী বইয়ের তর্জ্জমাটুকুর উপর দিনচালানো…খেতে-পরতে মাসিক কিস্তি দিতে পারেন না! চশমখোর মহাজন বলে—মানুষের চেয়ে পয়সার দাম তার কাছে অনেক বেশী…পৃথিবীতে পয়সাটাকেই সে চিনেছে! আদালতে নালিস করলো…তারপর ডিক্রি। ডিক্রি পেয়ে পাওনাগণ্ডা আদায়ের জন্য বাড়ীখানা লাটে তুলেছে। তখন হলো চেতনা! তাই তো, মেয়েটা যতক্ষণ আছে, মাথা গোঁজবার একটু আশ্রয়! সমাজে যখন বাস করছি, লোকলজ্জা আছে তো! তারপর…

কথায় কথায় মা সব কথাই বললেন শচীকে। শচী শুনলো রুদ্ধ নিশ্বাসে। তার মন এ-পরিবারের দুর্ভাগ্যে-দুর্ভোগে একেবারে গলে গেল!

শচী বললে—কিন্তু এতখানি ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না, মা। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে…

নিশ্বাস ফেলে মা বললেন—সে কথা এক-মিনিট ভুলতে পারিনে মা! কিন্তু কোথা থেকে কি করে তা হবে, ভাবতে গেলে মাথা ঘুরে যায়! জোর করে সে-ভাবনা চাপা দিয়ে মনকে বোঝাই, তাঁর মনে যা আছে, হবে। মানুষের চেষ্টায় কি-বা হয়!

সন্ধ্যার পর শচী বাড়ী ফিরলো। আসবার সময় মায়ের হাত ধরে অনেক করে বলে এলো—পরশু উনি শিলং যাচ্ছেন, কাল আপনারা তিনজনে দুপুরবেলা আমাদের ওখানে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করবেন। তারপর সারাদিন ওখানে বসে গল্প-সল্প।…আপনাদের দেখে আমার মনে হচ্ছে, যেন কতকালের চেনা! মনে হচ্ছে, চাঁপাকে নিয়ে যাই! কি বলো চাঁপা, যাবে?—এ-কথা বলে চাঁপার গালে শচী মৃদু টোকা মারলো।

চাঁপা কোনো জবাব দিলে না, মাথা নীচু করলে। তার মুখে হাসির একটু রেখা!

পরের দিন···সকাল বেলা। স্নান করে খাওয়া-দাওয়া সেরে বাসু যথারীতি কলেজের জন্য তৈরী হচ্ছে, মধুকে বিশেষ ফর্দ্দ দিয়ে শচী তাকে পাঠিয়েছে শ্যামবাজারে বাজার করতে। নিমন্ত্রিতদের ভোজের জন্য বিশেষ একটু আয়োজন। এ বিষয়ে শচীর যা-কিছু পরামর্শ··· মধুর সঙ্গে। রঘু বা কিরণ জানে না; বাসুও নয়। তার কারণ, ও-বাড়ীর ঐ করুণ কাহিনী শচীর মনকে সারাক্ষণ এমন অভিভূত রেখেছে যে আজ এখানে তাদের খাবার নিমন্ত্রণ, এ-কথা এদের বলতে শচীর মনে নেই! সকালে উঠে বাঁধা রুটিনে কাজ চলেছে···মধু সকাল-সকাল রান্না-বান্নার ব্যবস্থা করেছে···বেলা নটায় খাওয়া-দাওয়া সেরে বাসু যাবে কলেজে—তখন শচীর এ নিমন্ত্রণের কথা মনে পড়লো। মনে পড়তেই মধুকে ডেকে ব্যবস্থা···মধুকে বাজারে পাঠিয়ে শচী গেছে স্নান করতে।

বাসু কেতাবপত্র নিয়ে কলেজ যাবার জন্য নীচে নাগবে, কিরণ এলো ঘরে; বাসুকে বললে—কি, কলেজে চলেছিস! আজও টিউটোরিয়াল ক্লাশ কালকের মতো?

কিরণের দিকে চেয়ে বাসু ফোঁশ করে উঠলো—তার মানে?

কিরণ হাসলো। হেসে একটু সুর করে বললে—

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে —
কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে!

হাতে-নাতে তুমি শালা সন্থ ধরা পড়েছো!

বাসুর বুকের মধ্যে যেন কতকগুলো আরশুলা ফরফরিয়ে উঠলো··· বুকে রীতিমত ছমছমানি! বাসু বললে—ম্-ম্-মানে? কি তুমি বলতে চাও, শুনি?

কিরণ বললে—কাল যা বলেছিলুম···love at first sight.

কিরণ যেন বাসুর বুকে একরাশ আলপিন ফুটিয়ে দিলে! বাসু বলে উঠলো—লভ্···তার মানে? লভ্ কিসের?···ও, তুমি ভেবেছো, ঐ···ঐ···ঐ···ওদের বাড়ীর চাঁপা? ধ্যেৎ!

বলেই সে ফিরে ঘর থেকে বেরুলো—সিঁড়ি দিয়ে নামবে, দিদির সঙ্গে দেখা। শচী স্নান সেরে শুকনো শাড়ী পরে তোয়ালে দিয়ে ভিজা চুলগুলো ঘষতে ঘষতে সিঁড়ির সামনে বারান্দায়···বাসুকে দেখে শচী সবিস্ময়ে বলে উঠলো—ওকি রে, কোথায় চলেছিস?

বাসু দাঁড়ালো, হাতের বই আর খাতাগুলো দেখিয়ে বেশ গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলে—কেন? কলেজ!

শচী বললে—কলেজ কি রকম? আমি ওদিকে চাঁপাদের নেমন্তন্ন করে এসেছি···তারা আজ তুপুরবেলা এখানে এসে খাবে···সারাদিন থাকবে! তোর সঙ্গেই ওদের জানাশুনা···আর তুই বাড়ীতে না থেকে কলেজে চলেছিস!

বাসুর বুকের মধ্যে কড়াৎ করে বাজ পড়লো! কিন্তু উপায় নেই! ক্ষোভ অভিমান তুঃখ···একসঙ্গে মনের মধ্যে তাল পাকিয়ে উঠলো!

বাসু বললে—হ্যাঁ, কে তোমার ঐ চাঁপা না ফাঁপা নেমন্তন্ন খেতে আসবে বলে আমি কলেজ যাবো না?···বাঃ! আমার পার্সেণ্টেজ, হুঃ··· কথাটা বলে বাসু ফিরলো সিঁড়ির দিকে। শচীর কথা শুনে কিরণ এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছে···ভাইয়ের কথায় শচী কেমন হতভম্ব!

বাসুর দিকেই সে চেয়ে আছে! হেসে কিরণ বললে শচীকে উদ্দেশ করে—কি দেখছো?…গভীর প্রেম!

শচী এ-সব তত্ত্ব বোঝে না…ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েছে। তার কেমন মজা লাগলো! শচী বললে—প্রেম!

হেসে কিরণ বললে—হ্যাঁ গো, নাটকে নভেলে কবিতায় একেই বলে, প্রেম…ভালোবাসা!

শচী হাসলো। বাসু ততক্ষণে ঠক্‌ঠক্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে বাড়ীর বাহিরে…পথে…

বাসুর বাড়ী থেকে বাস ধরতে জয়গোপালের বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে হয়। বাড়ী থেকে যে-রেটে বাসু বেরিয়ে এসেছে, পথে নেমে গতির সে বেগ কমালো। মনের মধ্যে যেন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সুরু হয়েছে—গদা বল্লম তীর ধনুক…টঙ্কারে-ঝঙ্কারে বুকের ভিতরটা গম্‌গম্‌ করছে! দিদির উপর অভিমান—ওদের নিমন্ত্রণ করে আসা হয়েছে, সে-কথা আগে জানিয়ে দিতে পারোনি? এখন সে কলেজে যাবার জন্য তৈরী!…নিজের উপর রাগ হলো! ইডিয়ট! দিদি যখন ও-কথা বললে, তখন ধীর শান্তভাবে কথাটা মেনে কেতাবপত্র রেখে বাড়ীতে অনায়াসে থাকতে পারতো! তা নয়, বীরত্ব দেখিয়ে বলা হলো, চাঁপা না ফাঁপা…পার্সেণ্টেজ…বলে তীরের মত সোঁ করে বেরিয়ে আসা!…মন একেবারে ক্ষত-বিক্ষত—পা কিছুতে এগিয়ে যেতে চায় না! কিন্তু কি বলে ফিরবে? বিশেষ কিরণদার ঐ সব কথা—প্রেম…প্রেমের ফাঁদ…হাতে-নাতে ধরা পড়েছে!…সত্যই বাসু তাহলে…

এমনি নানা কথা মনের মধ্যে ঢেউ তুলেছে…বাসু এগিয়ে চলেছে…মোড়ে বাসের ষ্ট্যাণ্ড, সেইদিকে! সে চলেছে দম্‌-খাওয়া পুতুলের মতো! এ চলায় তার নিজের যেন এতটুকু মনের যোগ নেই। হঠাৎ

পাখীর কূজনের মত কাণে ভেসে এলো মিষ্ট মধুর কণ্ঠ—একটু তাড়াতাড়ি করে নাও মা! অত করে বলে গেলেন, যত সকাল-সকাল পারি, আমরা যেন যাই।

এ কণ্ঠ শোনবা মাত্র বাসুর চেতনা জাগলো! চেয়ে সে দেখে সামনে চাঁপাদের বাড়ী···সদরের কপাট আধাআধি ভেজানো। বাসু চমকে উঠলো। ইস্, এঁরা তাহলে তাদের ওখানে চলেছেন·· ওখানে খাওয়া-দাওয়া···তারপর সারাদিন থাকা! হায় রে! বাসুর নড়নচড়ন-রহিত···সে চুপ করে দাঁড়ালো।

ভিতরে মায়ের কণ্ঠে—এই তো রে, নিচ্ছি! আমি কি চুপ করে বসে আছি? এদিককার সব সেরে-সুরে···সারা দিনের মতো বেরুচ্ছি···

চাঁপা বললে—দেরী করে গেলে ভারী খারাপ দেখাবে না? মনে হবে যেন শুধু খেতেই গিয়েছি!

পথে দাঁড়িয়ে বাসু শুনছে আর শুনছে—বুকের মধ্যে নিশ্বাসের বাষ্প এমন জমে উঠছে—বুক যেন ফাঁপা বেলুন!

তারপর মায়ের কথা—নে, চ, আমার হয়েছে। উনি কোথায়?

ঘরের ভিতর থেকে জয়গোপালের সাড়া জাগলো। তিনি বললেন—তোমরা এগোও—আমার যেতে এগারোটা বাজবে। যে নভেলখানা ধরেছি, দু' একদিনের মধ্যে শেষ করে ফেলতে চাই। টাকা···

চাঁপা বললে—এগারোটার বেশী দেরী করো না, বাবা···লক্ষ্মীটি···না হলে ওঁরা কি মনে করবেন!

বাসু উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। বুঝলো, এবার ওঁরা বেরুবেন। ধরা না পড়ে! নিঃশব্দে টুক্ করে বাসু গিয়ে লুকোলো পথের ধারে ঘন খেজুর-ঝোপ, তার পিছনে। ঝোপের পিছনে নুয়ে দাঁড়িয়ে বাসু

দেখলো, চাঁপা আর তার মা ঐ বেরুলেন···বেরিয়ে ওদিকে ওদের বাড়ীর দিকে চলেছেন।···বাসুর মনে হলো, নিজের মাথাটা ঘুষি মেরে ফাটিয়ে দেয়···কিম্বা এই খেজুর-ঝোপে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে! কিন্তু···কিন্তু···

বাসু চেয়ে আছে ওঁদের পানে·· ঐ ওঁরা চলেছেন। ঐ··· ঐ···ঐ ঢুকলেন বাসুদের ফটকে!

নিশ্বাস ফেলে বাসু বেরুলো খেজুর-ঝোপের আড়াল থেকে। তারপর···

পারলো না মোড়ের দিকে বাস ধরতে যেতে। চুপ করে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলো। চাঁপাদের বাড়ীর দিকে তাকালো। মনে হলো, ও-বাড়ীতে যাই···গিয়ে ঐখানেই আজ সারাদিনটা···দু-পা এগুলো বাড়ীর সদরের দিকে। তখনি মনে হলো সর্ব্বনাশ, জয়গোপালবাবু বাড়ীতে আছেন! যদি বলেন, তুমি?···বলবো, আজ্ঞে···আপনারা এখনো মানে, তাই!···কিন্তু না, তা হয় না!

বাসুর বাড়ীতে অতিথিদের অভ্যর্থনা। কিরণ বললে—জয়গোপাল-বাবু? মা বললেন—তাঁর একটু কাজ আছে, সেরে এগারোটার মধ্যে আসবেন। শচী বললে—আসুন, আমরা উপরে যাই।···মা বললেন—আমার বাবা কোথায়? বাসুদেব?···শচী বললে—কলেজে গেছে। এত বললুম—তবু গেল।

মাকে আর চাঁপাকে নিয়ে শচী ঢুকলো ভিতরের দালানে···হঠাৎ বাগানে ফটকের কাছে দুদ্দাড় হুড়মুড় শব্দ! চমকে সকলে ফিরে তাকালেন। দেখেন, পথে এক-জায়গায় কতকগুলো খালি টব আর গামলা পাহাড়-করা ছিল—সেগুলো গেছে পড়ে—তারই শব্দ, এবং

সেই টবগুলোর পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালো বাসু! হাতের বই খাতা ছিটকে পড়েছে···বাসুর মুখে চোট কাদা ধূলো! শচী বলে উঠলো—তুই?

বাসু অত্যন্ত অপ্রতিভ! হাতের কাদা মুছতে মুছতে কোনোমতে বললে—হেঁ হেঁ···তাড়াতাড়িতে ব্-ব্-ব্-ব্-এ্যাগটা ফেলে গেছি বাড়ীতে, তাই···

শচীর মমতা হলো। সে এলো এগিয়ে; এসে বাসুর হাত ধরে বললে—ভালোই হয়েছে। আজ আর কলেজে যাস নে। বাধা পড়েছে! তা'ছাড়া এঁরা অতিথি···

একটা ঢোক গিলে বাসু বললে—আমার পার্সেণ্টেজ···

হেসে কিরণ বললে—সেটা আমি গিয়ে ঠিক করে দিয়ে আসবো।

সারাদিনটা চমৎকার কাটলো···সকলের। জয়গোপাল এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে ছুটোর আগে চলে গেছেন। বহু মিনতিতে ক্ষমা চেয়ে—তাঁর কাজ আছে···আলিপুরের কাছারিতে যাওয়া দরকার··· বাড়ীর দলিলপত্র আজ কাছারি থেকে উদ্ধার করে আনবেন।

চাঁপা, মা, শচী, কিরণ আর বাসু—একসঙ্গে হাসি-গল্প···বাগানে গিয়ে এটা-ওটা দেখা···ছিপ আনিয়ে কিরণ পুকুরে বসলো মাছ ধরতে··· বিকেলে চাঁপাকে নিয়ে শচীর ষ্টোভ জ্বেলে চা তৈরী করা, হালুয়া তৈরী করা। সকলে এমন মেলামেশা···পরস্পরের মধ্যে সঙ্কোচের এতটুকু আড়াল রইলো না···যেন কত কাল ধরে সকলের কত জানা-শুনা!

সন্ধ্যা হয়-হয়, মা বললেন—আমরা এবার আসি মা, সন্ধ্যা হয়ে এলো।···ভারী খুশী হয়েছি···জীবনে এমন দিন···স্বপ্নেও ভাবিনি, মা! কী খুশী তুমি করেছো···সে আমার মনই জানে! আশীর্ব্বাদ করি,

চিরদিন মা, এমনি খুশীতে তুমি থাকো !···এ-কথা বলে মেয়ের পানে চেয়ে মা বললেন—আয় চাঁপা···

মা আর চাঁপা যাবার জন্য উঠলেন···কিরণ বললে—আপনারা চললেন ?···আমি কিন্তু একটা কথা ভাবছিলুম···বলবো ?

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে মা বললেন—বলো না, বাবা।

আকাশের দিকে তাকিয়ে কিরণ বললে—চমৎকার চাঁদ উঠেছে··· চলুন না, সকলে নৌকোয় চড়ে খানিক······

এ কথায় শচী যেন মেতে উঠলো ! উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বললে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন, বেশ হবে। কি বলো, চাঁপা ?

মা বললেন—আমি আর যাবো না, মা। বাড়ীতে কাজ আছে। তুমি বরং চাঁপাকে নিয়ে যাও। আমাদের সঙ্গে ও খালি দুঃখই ভোগ করছে, তোমাদের সঙ্গে দু-দণ্ড একটু আরাম পায় যদি···

তখনি সব ঠিকঠাক।

১২

মা ফিরলেন বাড়ী। চাঁপাকে নিয়ে শচী, কিরণ আর বাসু এলো ঘাটে। একখানা পান্সী নিয়ে তাতে চড়ে বেরুলো। চাঁদের আলোয় গঙ্গার বুক ঝলমল করছে···মন্দিরে আরতি হচ্ছে···কাঁশর-ঘণ্টার ধ্বনি··· ঘাটে কে বসে চমৎকার গান গাইছে···পরমার্থ-সঙ্গীত ! গায়কের কণ্ঠ আর সুর মিলে স্নিগ্ধ শান্তি জাগিয়ে তুলেছে আকাশে-বাতাসে।

পান্সীতে বসে বাসুর সখ—দাঁড় টানবে ! ঠাট্টা করে কিরণ বললে ঈষৎ মৃদু কণ্ঠে—প্রেমিকার সামনে নিজেকে সব দিক দিয়ে হীরো বানাতে চাস, এই তোর মতলব ?

সলজ্জ ভঙ্গীতে বাসু বলে উঠলো—যাও কিরণদা, সব-তাতে তোমার…

চাঁপাকে শচীর নানা প্রশ্ন…সে চায় চাঁপার মনের সব পরিচয়টুকু জানতে! তার এত ভালো লেগেছে চাঁপাকে…

শচী বললে—তুমি তাহলে ঐ ক্লাশ নাইন অবধি পড়ে পড়া ছেড়ে দেছ!

চাঁপা বললে—ক্লাশ নাইনে প্রোমোশন পাবার পরেই বিপর্য্যয়! এখানে চলে এলুম।…স্কুলে পড়বো, পয়সা কৈ? তবু বাবা সমানে বাড়ীতে পড়িয়েছেন…ম্যাট্রিক-ষ্টাণ্ডার্ড ধরে! বাবার ইচ্ছা, আমি প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিই! কিন্তু…

নিশ্বাসের বাষ্পে চাঁপার কণ্ঠ হলো রুদ্ধ।

বাসু একাগ্র মনে চাঁপার কথা শুনছে…হাতের দাঁড় হাতে…কিরণ ডাকলো—বাসু…

বাসুর হুঁশ হলো। হুঁশ হতেই এমন জোরে দাঁড় ফেললো, জল ছিটকে কিরণকে দিলে ভিজিয়ে! কিরণ ধমকে উঠলো—এই…

পান্সী নিয়ে কত দূরে ভেসে যাওয়া…মাঝ-গঙ্গা বেয়ে…দু-ধারে তীররেখা জ্যোৎস্না মেখে দেখাচ্ছে যেন কোন্ মায়াপুরীর সীমানা! তীরে মিশ্র কলগুঞ্জন…গঙ্গার বুকে আরো দু-চারখানা নৌকো চলেছে—তার কোনোটাতে মাঝি গান গাইছে…কোনোটাতে তর্ক-বিরোধ…

হঠাৎ শচী বললে—তুমি তো গান জানো—তোমার মার কাছে শুনলুম। একটা গান গাও, ভাই—সত্যি। ভারী ভালো লাগবে! এই চাঁদের আলো…গঙ্গার বুকে…

চাঁপা কোনো জবাব দিলে না…লজ্জায় মাথা নামালো।

নিস্তার মিললো না কিন্তু। শচীর সঙ্গে কিরণের তাগিদ। চাঁপাকে গাইতে হলো। চাঁপা গাইলো…রবীন্দ্রনাথের গান। চাঁপা গাইলো—

ও কি আকুলতা ভুবনে
এ কি চঞ্চলতা পবনে!
এ কি মধুর মদির রসরাশি।…

এমনি কথায় হাসি-গানে গঙ্গার বুকে পান্সীতে করে ভেসে বেড়ানো… আনন্দে সকলে মশগুল! রাত বেড়ে চলেছে, কারো হুঁশ নেই! হঠাৎ কোথায় কোন মিলের ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজলো নটা। শচী চমকে উঠলো…বললে—নটা বাজলো! ইঃ, তাইতো, কোনো খেয়াল নেই!

শচী তাকালো চাঁপার দিকে—কুণ্ঠিতভাবে বললে—তোমাকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত আটকে রেখেছি—সত্যি, ভারী অন্যায়! তোমার মা বাবা হয়তো রাগ করবেন!

সহজ শান্তভাবে চাঁপা বললে—না।

শচী বললে—তাহলেও আর নয়, এবারে ফেরা যাক।

বাসুর বুকখানা ছ্যাঁৎ করে উঠলো! মনে হলো, চমৎকার লাগছিল! আরও, আরও…সারারাত যদি এমনি করে এই পান্সীর দাঁড় বয়ে তাকে কাটাতে হয়…

কিন্তু ফিরতে হলো। ফেরবার সময় আনন্দের সে গুঞ্জন আর নেই। শচীর-মন উতলা…অন্যায় রকমের দেরী! হাজার হোক, চাঁপা পরের মেয়ে। তার সঙ্গে ওঁরা বেড়াতে ছেড়ে দেছেন বলে এত রাত পর্য্যন্ত… সকলে চুপচাপ।

কিরণ বলে উঠলো—এমন নিঝুমের পালা…তোমাদের হলো কি? একখানা গান…

শচী বললে—না। ভাবনায় আমার মন যখন এমন···চাঁপার মনে নিশ্চয়···ওকে কোন্ মুখে আর গান গাইতে বলবো ?

এখানে গঙ্গার বুকে এদের যখন এই হাসি-গান-আনন্দ···তখন ওদিকে দক্ষিণেশ্বরের বাড়ীতে যা ঘটে গেল···যেন উপন্যাসের এক রোমাঞ্চকর পরিচ্ছেদ ! অর্থাৎ···

সন্ধ্যার সময় শচীরা সদলে বাড়ী থেকে বেরুবার পরেই রঘু আর মধু—দুজনের একটু মন্ত্রণা ! পাড়ায় বারোয়ারি-যাত্রা হচ্ছে, রঘু এসে মধুকে বললে—ওঁদের তো ফিরতে দেরী হবে—চ' না, একটু শুনে আসি। দক্ষযজ্ঞ পালা রে !

মধুর মন একটু চঞ্চল হলো। সে ভাবলো···বাতাসে ভেসে-আসা বাজনা আর জুড়ির গান কাণে লাগছে···চঞ্চল মন আরো চঞ্চল হলো। মধু বললে—হুঁ···কিন্তু বাড়ী আলগা রেখে···

রঘু বললে—কেন, সদা মালী আছে !

ঠিক ! দুজনেই একটু সভ্যভব্য-বেশে এলো বাহিরে। দালানের বাহিরে সেই বুড়ো মালী সদা ছোট কোল্‌কেয় গাঁজা চড়িয়েছে—মানে, একটু তোয়াজ ! মধু আর রঘু এসে তাকে বললে—শোন্, বাবুরা বেরিয়েছে ··হুই মোড়ে যাত্রা হচ্ছে, থপ্ করে একটু শুনে আসি। বাড়ী আলগা রইলো। তুই এখান থেকে নড়বি নে। বুঝলি···

সদা বলল—হুঃ···

মধুর দিকে চেয়ে রঘু একটু ভয়ে ভয়ে বললে—বাবুরা যদি এর মধ্যে এসে পড়ে, মধু ?

মধুর মনে একটু চিন্তা ! তারপরই মধু বললে—হুঁ···শোন্ সদা, বাবুরা এসে যদি খোঁজ করে, বলিস্, ঐ মোড়ে পানের দোকানে···

সদা বললে—হঃ···

মধু আর রঘু চললো যাত্রা শুনতে।

মধু আর রঘু চলে যাবার বিশ-পঁচিশ মিনিট পরে বাড়ীর ফটকে একখানা সেকেণ্ড-ক্লাশ ঠিকা গাড়ী এসে দাঁড়ালো। গাড়ীর মধ্যে মথুরামোহন এবং বাচস্পতি—কোচবক্সে গাড়োয়ানের পাশে বটা। গাড়ীর মাথায় মোটঘাট।

গাড়ী থামতেই বটা টক্ করে নেমে পড়লো, নেমেই ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ীর দিকে মুখ করে হাঁকলো—মধু···মধু··· রঘু-ঠাকুর···

কারো সাড়া নেই। গাড়ীর দরজা খুলে বটা বললে মনিবকে উদ্দেশ করে—আপনারা নামুন, আমি মোটঘাট নামাচ্ছি।

এ-কথা বলে বটা মোটঘাট নামাতে ব্যস্ত। গাড়ী থেকে নেমে মথুরামোহন চুপ করে দাঁড়ালেন। বাড়ীর মধ্যে নীচেকার দালানে আলো জ্বলছে···দেখে বাচস্পতি সেইদিকে এগুলেন। খানিক এগুতে সদার সঙ্গে দেখা। তিনি ডাকলেন—এরে···

সদা তখন কোলকের বেশ একটান নেছে মুখে, বাচস্পতির অতর্কিত ডাকে চমকে সে বললে—হঃ···

পথে গাড়ীর দিকে দেখিয়ে বাচস্পতি তাকে বললেন—যা, গাড়ী থেকে মালপত্তর আনতে হবে!

—হঃ! বলে মালী এগুলো গাড়ীর দিকে।···

বাচস্পতি এলেন মথুরামোহনের কাছে, বললেন—আসুন, আমরা ভিতরে যাই।

মথুরামোহনের কেমন বিস্মিত ভাব! তিনি বললেন—মধু? মধুকে পেলে না?

—হয়তো ভিতরে আছে। এরা মোটঘাট নামাক—আমরা ভিতরে গিয়ে মধুকে পাঠিয়ে দেবো।

গম্ভীর কণ্ঠে মথুরামোহন বললেন—হুঁ। তারপর বাচস্পতির সঙ্গে তিনি এলেন বাড়ীর মধ্যে। ঢুকেই সামনে দালান। দালানের একপাশে বসবার কামরা, আর একদিকে উপরে ওঠবার সিঁড়ি। মাঝখানে প্যাশেজ···ভিতর-বাড়ীর দিকে গেছে। দালানে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে।

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলেন। উপরে উঠে সামনে বারান্দা—বারান্দার কোলে পাশাপাশি ঘর। ঢাকা বারান্দা···টানা লম্বা। বারান্দার পর ওদিকে খোলা ছাদ। বারান্দাতেও ইলেকট্রিক বাতি জ্বলছে। কর্ত্তা এই বারান্দায় ওঠবামাত্র যা দেখলেন—শিউরে উঠলেন! যেন সাপ, না, বাঘ দেখেছেন, এমনি ভাব!

দেখলেন, বারান্দার রেলিংএ ঝুলছে শাড়ী-সেমিজ···কেচে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। এ-বাড়ীতে শাড়ী-সেমিজ? মথুরামোহনের নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে যাবে! তিনি তাকালেন বাচস্পতির দিকে, রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—এ সব?···অনাচার!

বাচস্পতি ছিলেন মথুরামোহনের পিছনে···শাড়ী-সেমিজ দেখেননি; মথুরামোহনের কথায় তিনি প্রতিধ্বনি তুললেন—অনাচার!···সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি পড়লো বারান্দার রেলিংএ ঝুলোনো শাড়ী আর সেমিজের উপর! তিনিও চমকে উঠলেন! বললেন—তাই তো!

মথুরামোহন যেন কাঠ···প্রায় দু'তিন মিনিট! তারপর যেন আরো কিছু আবিষ্কার করতে চান, এমনি সন্ধানী দৃষ্টি চারিদিকে সঞ্চালিত করতে করতে ধীর-পায়ে তিনি ঢুকলেন সামনের ঘরে। যেন আগুনের উপর পা পড়েছে, ছিটকে এমনি ভাবে ফিরে তিনি তাকালেন বাচস্পতির দিকে, বললেন—ত্যাখো······

বাচস্পতি বললেন—আবার কি?

নিশ্বাস ফেলে মথুরামোহন বললেন ঘরের মধ্যে দেখিয়ে—ঐ ছাখো... নিজের চোখে।

দুচোখ বিস্ফারিত করে বাচস্পতি দেখেন, ঘরের মধ্যে খাটে বিছানা...দুজনের পাশাপাশি শোবার আয়োজন...দুটো মাথার বালিশ, পাশ-বালিশ...আর্শির টেবিলের উপর সিঁদূরের কৌটো, বড়-দাড়া চিরুণী, মাথার ফিতা, মাথার কাঁটা—প্রসাধনের নানা সামগ্রী...আল্‌নায় ঝুলছে শাড়ী-সেমিজ, মেয়েদের জামা, একপ্রস্থ ট্রাউজার্স, কোট, নেকটাই হ্যাট প্রভৃতি।

মথুরামোহন একটা বড় নিশ্বাস ফেললেন, ফেলে বললেন—এখন বুঝতে পারলে বাচস্পতি, তোমার বাসুবাবুর বারোশো টাকার প্রয়োজন হয় কেন?

.. বাচস্পতি যেন আকাশ থেকে পড়েছেন! তাইতো! তিনি বললেন—হুঁ! কিন্তু বাসুদেব...

মথুরামোহন চুপ করে আছেন...যেন মন্ত্র পড়ে কে তাঁকে বোবা করে দেছে!

সদা মালী আর বটা ধরাধরি করে বিছানার মোটটা নিয়ে দোতলায় উঠলো। মালীর দিকে তাকিয়ে বাচস্পতি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর বাবু কোথায়?

দালানে বিছানার মোট নামিয়ে সদা বললে—ববু! ববু তুই দিদিমণিদের অর ববুকে নিয়ে হবা খেতে বেরিয়েচে।

এ-কথায় মথুরামোহন পাষাণের আবরণ ভেঙ্গে সচেতন হলেন। হতভম্বের মতো তিনি তাকালেন সদা মালীর দিকে। বাচস্পতির পায়ের নীচে পৃথিবীখানা দুলে উঠলো যেন! বাচস্পতি বললেন—দিদিমণি?

মথুরামোহনের মুখ থেকে তাঁর অজ্ঞাতেই স্বর ফুটলো—মেয়েলোক?

সহজ কণ্ঠে সদা মালী জবাব দিলে—হুঃ। ছুটি!

বিছানার মোটটা বটা ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে রেখে আবার বারান্দায় এলো; এসে মালীকে বললে—এবার বাক্স-তোরঙ্গগুলো নিয়ে আসবি চ।

মথুরামোহনের কণ্ঠে বজ্রনাদ! তিনি বললেন—না, আর কোনো মাল নামাবি নে।

বটা অবাক···মথুরামোহনের দিকে তাকালো।

মথুরামোহন বললেন—এ বিছানার মোট এখনি নামিয়ে নিয়ে যা··· নিয়ে গিয়ে সব মালপত্তর আবার গাড়ীতে তোল্।

বটার বিস্ময়ের সীমা নেই! সে বললে—আজ্ঞে···

মথুরামোহন বললেন—হ্যাঁ। এ-বাড়ীতে আর একদণ্ড আমি থাকবো না। এই জঘন্য অনাচারের মধ্যে না, আর এক মিনিট নয়!··· রেলের বই···

বটা তখনি তার সেই ক্যাম্বিসের থলি থেকে রেলের টাইম-টেবলটা বার করে মনিবের হাতে দিলে। বইখানা বাচস্পতির হাতে দিয়ে মথুরামোহন অনুজ্ঞার কণ্ঠে বললেন—ছাখো বাচস্পতি, ফেরবার ট্রেণ কখন?

ঈষৎ দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে বাচস্পতি বললেন—এই এত পথ এলেন··· এখনি? একটু বিশ্রাম না করে···?

কঠিন কণ্ঠে মথুরামোহন বললেন—না···বিশ্রাম নয়! এখনি যেতে চাই। এ নরকে তুমি বিশ্রাম করতে বলো?···তুমি ছাখো ফেরবার ট্রেণ··· কখন ছাড়বে!

বাচস্পতি টাইম-টেবল দেখছেন···বটা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে···

তাকে ধমক দিয়ে মথুরামোহন বললেন—হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে! বিছানার মোট নামিয়ে নিয়ে যা।

হুকুমের চাকর···মনিবের হুকুম বটাকে পালন করতে হলো। সদার সঙ্গে ধরাধরি করে বিছানার মোট নিয়ে সে নেমে গেল···মথুরামোহন দেখলেন। মোট নিয়ে বটা নেমে গেলে তিনি তাকালেন বাচস্পতির দিকে, বললেন—কি···কখন?

টাইম-টেবলের পাতায় দৃষ্টি রেখে বাচস্পতি বললেন—আজ্ঞে, এই যে নটা কুড়িতে ছাড়বে।

মথুরামোহন বললেন—বেশ, চলো···

তিনি সিঁড়িতে এক-পা নামলেন—নেমে থমকে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে বাচস্পতির দিকে চেয়ে বললেন—একটু দাঁড়াও। একটা কাজ বাকি। চলো ঐ ঘরে···ভ্যাখো, কাগজ-পেন্সিল আছে কিনা।···একখানা চিঠি লিখে যেতে চাই।

বাচস্পতির সঙ্গে মথুরামোহন ঘরে ঢুকলেন। বসলেন না—দাঁড়িয়ে রইলেন। কাগজ কলম পাওয়া গেল। বাচস্পতি বললেন—এই যে···

মথুরামোহন বললেন—লেখো···বলে তিনি বললেন—

এখানে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। আচার-ব্যবহার বিশুদ্ধ রাখিবার জন্য সহস্র উপদেশ দিয়া তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছি, কিন্তু এমন অধঃপাতে যাইতে পারো, আমি কল্পনা করি নাই! যদি নিজের মঙ্গল এবং আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে চাও, তাহা হইলে অবিলম্বে এখানকার বাসা তুলিয়া বাড়ী ফিরিবে। ইতি···

কথাগুলো বাচস্পতি লিখলেন। তাঁর লেখা শেষ হলে মথুরামোহন বললেন—কি লিখলে, পড়ো, শুনি।

বাচস্পতি পড়ে শোনালেন। মথুরামোহন বললেন—ঠিক আছে। দাও, সই করি।

কাগজখানা নিয়ে চিঠির তলায় মথুরামোহন নাম সই করলেন। তারপর নীচে নেমে গাড়ী···গাড়ী চড়ে সোজা একেবারে শেয়ালদা ষ্টেশন।

দক্ষিণেশ্বর···ঘাটে নেমে কজনে গল্প করতে করতে বাড়ীর দিকে ফেরা। শচী বললে—আজ কী আনন্দেই দিনটা কাটলো! পশ্চিমে থাকি···একলা···আমার এত ভালো লাগছে।

এই পর্য্যন্ত বলে কিরণকে উদ্দেশ করে শচী বললে—তুমি কাল রাত্রে শিলং চলে যাচ্ছো, না হলে কাল কোথাও পিকনিকের ব্যবস্থা করা যেতো!

হেসে কিরণ বললে—আমি যাচ্ছি, তাতে কি! বাসু রইলো তো।

শচী বললে—বাসুর কলেজ আছে।

কিরণ বললে—কলেজ? আরে, আজকে ও ব্যাগ নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল,···পিকনিকের ব্যবস্থা করলে কাল ও ব্যাগ আর খুঁজে পাবে না···তাহলেই ব্যস! কিরে?

বাসু ফোঁশ করে উঠলো! সে বললে—এ কথার মানে?···ত্-ত্-তুমি বলতে চাও, আমি ইচ্ছা করে ব্-ব্-এ্যা···

বাসুর মাথায় ছোট-একটা টোকা মেরে কিরণ বললে—থাম্, আর ব্যা-ব্যা করতে হবে না! ব্যা-ব্যা-মানে, ভেড়া বনে গেছ, তা আমরা বুঝতে পারছি না, ভাবছিস্?

—কি রকম?

কিরণ বললে—কি রকম, সে পরে বলবো—এখন নয়।

বাড়ীতে পৌঁছে ফটকের সামনে তিনজনে দাঁড়ালো। এবার বিদায়ের পালা। শচী বললে কিরণকে উদ্দেশ করে—তা হ্যাঁ ওগো, তুমি চাঁপাকে পৌঁছে দিয়ে এসো।

কিরণ বললে—আমি! কিন্তু কাল আমাকে যেতে হবে···তার গোছগাছ আছে—অফিসের অনেক কাগজপত্র পড়ে গুছিয়ে নেওয়া। কি করে যাই? আমি বলি, বাসু যাক—পৌঁছে দিয়ে আসুক। ওর সঙ্গে দস্তুরমত পরিচয়···কি রে বাসু, পারবি না পৌঁছে দিতে?

অত্যন্ত অপ্রতিভ কণ্ঠে বাসু বললে—আ-আ-আমি?

হেসে কিরণ বললে—দাঁড় টেনে হাতেই নয় ব্যথা হয়েছে, পায়ে তো হয়নি!

চাঁপা বলে উঠলো—না, না, কাকেও যেতে হবে না। আমি নিজে যাবো।

কিরণ বললে—তা হয় না।

চাঁপা বললে—চিরকাল এপথে যাওয়া-আসা করছি—এখানেই থাকি।

কিরণ বললে—তা হোক! আজ আমাদের অতিথি তুমি! কাজেই··· বলে বাসুর পানে চেয়ে কিরণ বললে—যা বাসু, পৌঁছে দিয়ে আয়।

চাঁপাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শচী বললে—ছাড়তে ইচ্ছা করছে না ভাই, তবু ছেড়ে দিতে হবে। আমি যাবো'খন···মাকে বলো।

শচী আর কিরণ ঢুকলো বাড়ীর মধ্যে। চাঁপা তাঁদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাসু উস্‌খুস্‌ করছে···মনের মধ্যে একরাশ কথা! কোনোমতে বাসু বললে—চলুন···

চাঁপা বললে—হ্যাঁ।···তারপর দুজনের পথ চলা।

বাসুর বুকে টুকরো-টুকরো কথার কুচি···বাতাসে কাগজের কুচি যেমন এলোমেলো উড়তে থাকে, তেমনি এলোমেলো ভাবে উড়ছে!

এমন উড়ছে, কোনোটা বাসু ধরতে পারছে না! নিঃশব্দে দুজনে চলেছে, হঠাৎ বাসুর কণ্ঠে কথার একটু কুচি—চ-চ-চ ঁাপা···

চাঁপা চলেছে আগে-আগে। কথার এ কুচিটুকু তার কানে লাগলো। চাঁপা দাঁড়ালো··বাসুর দিকে ফিরে চাঁপা বললে—আমাকে ডাকলেন?

বাসু বললে—হ্যাঁ।···তারপরই তার সব কেমন গুলিয়ে গেল! তাই তো! কিন্তু চাঁপা তার দিকে চেয়ে আছে! বাসু কেন ডাকলো, শুনবে বলে! অতএব···কোনোমতে বাসু বললে—মানে, আমি বলছিলুম, বড্ড মশা! না?

চাঁপা অবাক! তার কেমন মজা লাগলো! চাঁপা বললে—মশা!

—হ্যাঁ। মনে হলো···যেন আমার কানের মধ্যে···বলেই নিজের কানে ঠাশ্ করে একটা চড় মারলো।···

চাঁপার দিক থেকে কোনো সাড়া নেই। · চাঁপা কেমন অবাক হয়ে বাসুর পানে চেয়ে আছে! বাসুর সঙ্কোচ বোধ হলো।

বাসু বললে—মানে, হয়তো আমার ভুল! হয়তো আর কিছু···

এ-কথার পর ক'পা চলা। চাঁপা হঠাৎ দাঁড়ালো···দাঁড়িয়ে বাসুর দিকে ফিরে বললে—একটা কথা বলবো?

বাসু যেন হুঁচট খেয়ে পড়বে···কোনোমতে টাল সামলে বাসু বললে—আ-আ-আমাকে?

মৃদু হেসে চাঁপা বললে—হ্যাঁ।

—ব-ব-বলুন।

চাঁপা বললে—আপনাকে ধাঙড় মনে করেছিলুম। আর তাই মনে করে যা-তা কত-কি বলেছি, আপনি হয়তো তার জন্ম খুব রাগ করেছেন!

—ন্-ন্-ন্-ন্-নাঃ।

বাসুর মনে হলো, সে যেন আর নেই! এমন মিষ্ট-মধুর কথা সে কারো মুখে কখনো শোনে নি আগে!

তারপর আবার চলা।

জয়গোপালের বাড়ী। সদরের কপাট ভেজানো ছিল। কপাটের সামনে দাঁড়িয়ে বাসুর দিকে চেয়ে চাঁপা বললে—আসি তাহলে...

বাসুর মুখে কথা নেই! তার মনে হচ্ছে...যেন...আরব্য উপন্যাসে আবুহোসেনের গল্প পড়েছে...একদিনের বাদশাহী-লীলার পর নিজের জীর্ণ ঘরে পরের দিন ঘুম ভাঙ্গবার পর তার যেমন মনে হয়েছিল, বাসুর ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে! বাসুর মুখ কাগজের মতো সাদা...চোখে এক-রকম দৃষ্টি! সে দৃষ্টির মর্ম্ম চাঁপা কি বুঝলো, চাঁপাই জানে। চাঁপা বললে—ভিতরে আসবেন?

বাসুর মন নেচে উঠলো!...কি আরাম যে পেলো এ আহ্বানে! বাসু বললে—আ-আ আসবো?...পরক্ষণে সমস্ত পৃথিবী তার বাস্তব রূপ নিয়ে বুকের মধ্যে হৈ-হৈ কলরব তুললো! নিজেকে সম্বরণ করে বাসু বললে—না, যাবো না। বাড়ীতে দিদি, কিরণদা...ঠাট্টা করবে!

চাঁপা দাঁড়ালো না, ভিতরে গেল; গিয়ে সদরের কপাটে ভিতর থেকে হুড়কো এঁটে দিলে। বাসু তখনো বাইরে দাঁড়িয়ে আছে...কাঠের পুতুল! হঠাৎ সে পুতুলের বুকে যেন বিদ্যুতের তরঙ্গ চিকমিকিয়ে গেল...পুতুলের মনে হলো, তাই তো, চলে গেল! কত কথা বলবো ভেবেছিলুম! তার কোনোটা...

যন্ত্র-চালিতের মতো সে সদরের কপাটে টুকটুক করে টোকা মারলো। কপাট খুলে গেল এবং সেই খোলা কপাটের সামনে চাঁপার মর্ম্মর মূর্ত্তি! চাঁপা বললে—কিছু বলচেন?

এ প্রশ্নে আবার সব কথা গুলিয়ে তালগোল পাকিয়ে গেল! কোনোমতে বাসু বললে—হ্যাঁ।

—বলুন।

বাসু বললে—একটা ল্-ল্-অণ্ঠন দিতে পারো?

সবিস্ময়ে চাঁপা বললে—লণ্ঠন!

—হ্যাঁ। আমি…মানে, এখনি আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।

চাঁপার বিস্ময় আরো নিবিড়। সে বললে—লণ্ঠন নিয়ে আপনি কি করবেন?

আমতা-আমতা করে বাসু বললে—না, মানে…এই অন্ধকার রাত্রি কিনা, পথে নুড়িনোড়া আছে, যদি হুঁচট খাই, তাই…

চাঁপা যেন অট্টহাস্যে ফেটে পড়বে! নিজেকে সম্বরণ করে চাঁপা বললে—অন্ধকার রাত্রি!…আজ পূর্ণিমা!…আকাশে অত বড় চাঁদ…জ্যোৎস্না ফিনিক ফুটছে!

বাসু লজ্জায় এতটুকু! এতক্ষণ এ জ্যোৎস্না তার চোখে পড়েনি।… মনে হচ্ছিল, চারিদিকে যেন অন্ধকার ঘন হয়ে জমে উঠছে! চাঁপার কথায় লজ্জা পেয়ে কোনোমতে বাসু বললে—ও, ঠিক বলেছেন! পূর্ণিমা…জ্যোৎস্না…আ-আ-আমি আকাশের দিকে চেয়ে দেখিনি কিনা! তা আসি তাহলে…নমস্কার।

বাসু আর এক সেকেণ্ড দাঁড়ালো না—বাড়ীর পথে ফিরলো। দূর থেকে কানে এসে লাগলো এ-বাড়ীর সদরের কপাট বন্ধ করার শব্দ। বাসুর মনে হলো, তার বুকের কপাটখানাও যেন কে দড়াম করে বন্ধ করে দিলে!

বাড়ী ঢুকে শচী গেল মুখ-হাত ধুতে···কিরণ একেবারে দোতলায় শোবার ঘরে। ঘরে আলো জ্বলছে, কিরণের চোখ পড়লো আরশির টেবিলের উপর—বাসুর নামে লেখা ভাঁজ-করা কাগজের চিরকুট। ভাঁজ খুলে পড়ে দেখে···সর্ব্বনাশ!···বিনা-মেঘে বজ্রপাত!

চিঠিখানা হাতে করে কিরণ আকাশ-পাতাল কত কি ভাবছে··· বাহিরে বারান্দায় শচীর হাতের চুড়িতে রিনিঝিনি শব্দ। কিরণ ডাকলো—ওগো···এদিকে এসো। দেখে যাও ব্যাপার।

সকৌতূহলে শচী ঘরে ঢুকলো, ঢুকে বললে—কি? কি হয়েছে?

চিঠিখানা শচীর হাতে দিয়ে কিরণ বললে—তোমার বাবা এসে-ছিলেন···বাচস্পতি মশাইয়ের সঙ্গে।

শুনে চিঠি না খুলেই শচী সবিস্ময়ে বলে উঠলো—বাবা!

কিরণ বললে—হ্যাঁ। এসে ধূলো-পায়েই চলে গেছেন···বাসুর উপর এই দোর্দ্দিণ্ড পরোয়ানা জারি করে।

শচী বেশ একটু চিন্তিত হলো। চিন্তিত হয়েই চিঠি পড়া···কিরণ টিন থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালো। সিগারেট মুখে তারো চিন্তা সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে ঘনায়িত···শচীর পানে একাগ্র-দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে।

চিঠি পড়া শেষ হলে শচী তাকালো কিরণের দিকে—তার ভ্রূযুগ কুঞ্চিত। শচী বললে—এ চিঠির মানে? বাসু কি এমন ভয়ানক অপরাধ করেছে, যার জন্য এমন করে বাবা তাকে···

কিরণ বললে—হয়তো ঐ বারোশো টাকার কথা কোনোমতে তাঁর

কানে গেছে! যাওয়া বিচিত্র নয়। বংশগোপাল এটর্ণি তাঁকে খবর দেছে, মনে হয়। খবর দেওয়া স্বাভাবিক।

শচী যেন দিশাহারা! সে বললে—তাহলে এখন?···তুমি তো কাল শিলং যাচ্ছো···আর কালই এখানকার আস্তানা তুলে বাসুর উপর বাড়ী ফেরবার হুকুম! বাবা যেরকম মানুষ···এই পর্য্যন্ত বলে অসহায় দৃষ্টিতে শচী তাকালো খোলা জানলা দিয়ে বাহিরের পানে।

নিশ্বাস ফেলে কিরণ বললে—মুস্কিল!

দুজনে চুপচাপ···দুজনের মনে চিন্তার তরঙ্গদোলা।

চাঁপাকে পৌছে দিয়ে বাড়ী ফিরতে বাসুর পা আর চলে না! মনে হচ্ছে, এতক্ষণ কি আমোদ···হাসি-গানের মধ্যে কত আরাম···আর এখন তার কিছু নেই! মনে হচ্ছে, যদি এমন উপায় থাকতো···ঐ চাঁপাদের বাড়ীর একটি কোণে তার থাকা···

পায়ে-পায়ে বাড়ী পৌছুতে হলো। ভিতরে যেতে মন চায় না! যে বাড়ী সারাদিন উৎসবে আনন্দে মুখর ছিল, এখন উৎসব-শেষে যেন পাথর-পুরী! রূপকথার গল্প মনে পড়লো···চমৎকার সাজানো রাজার পুরী—পুরীর সঙ্গে লাগোয়া ফুলের বাগান, ফলের বাগান, জলভরা দীঘি···সোনার পালঙ্কে রূপবতী রাজকন্যা···ফুলপরী জলপরীদের নাচ-গান···হঠাৎ কোন্ দৈত্যের যাদু-কাঠির ছোঁয়ায় মোটা কালো পর্দ্দায় ঢাকা পড়ে সে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে!

ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে বাসু চেয়ে আছে ওদিক-পানে···চাঁপাদের বাড়ীর দিকে···শূন্য উদাস মন।

হঠাৎ রিক্শর ঘণ্টার শব্দ। সেই সঙ্গে খুব পরিচিত কণ্ঠ—এই রাখ্, রাখ্, রাখ্···এই বাড়ী।

চমক ভেঙ্গে বাসু চেয়ে দেখে, একখানা রিক্‌শ গাড়ী। রিক্‌শখানা থামলো তাদের বাড়ীর সামনে···ফটকে এবং গাড়ী থেকে নামলেন বাচস্পতি মশায়।

বাসু চমকে উঠলো! স্বপ্ন দেখছে নাকি?

গাড়ী থেকে নেমে বাসুকে সামনে দেখে বাচস্পতি বললেন—রাত্রে বাহিরে দাঁড়িয়ে! বলে রিক্‌শওলাকে ভাড়া চুকিয়ে নিজের ছোট লগেজ নামিয়ে নিয়ে বাচস্পতি বললেন—কি···কার জন্য দাঁড়িয়ে?

সে-কথা বাসুর কানে গেল না। তার বিস্ময়ের চমক আর কাটে না! রুদ্ধ-শ্বাসে সে বললে—কিন্তু···তুমি এখানে হঠাৎ?

মৃদু হেসে বাচস্পতি বললেন—হুঁ। কাছারির পেয়াদা···শমন ধরাতে এসেছি।

বাসু অবাক! বললে—শমন?

বাচস্পতি বললেন—হ্যাঁ, উপরে চলো, বলছি।

বাচস্পতি নস্য নিয়ে বেশ একটিপ নাকে গুঁজে বাসুকে বললেন—চলো।

যেতে যেতে কথা···বাচস্পতি বললেন—কর্ত্তা এসেছিলেন।

বাসুর সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ! বাসু বললে—বাবা?

—হ্যাঁ।

বাসু বললে—বাবা তাহলে উপরে···

বাচস্পতি বললেন—না। এসে তিনি আর বসেন নি···তখনি সেই গাড়ীতেই চলে গেছেন। তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আমি আসছি। তোমার নামে শমন আছে···তা ছাড়া অনেক রকম তদন্ত।

বাসুর বুকখানা ধ্বক্ করে উঠলো! কম্পিত কণ্ঠে সে বললে—এ-সব কি বলচো, বাচস্পতিদা?

বাচস্পতি বললেন—তুমি এখানে নানারকম অনাচার করচো !

বাসু বললে—অনাচার !

—হ্যাঁ।

কথা কইতে কইতে দুজনে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন···দোতলার বারান্দা···বারান্দার রেলিংএ শুকোচ্ছে সেই শাড়ী আর সেমিজ। সেগুলোর দিকে দেখিয়ে বাচস্পতি বললেন—ঐ !···একের নম্বর অনাচার···এই শাড়ী আর সেমিজ।

এ-কথার অর্থ বুঝতে না পেরে অস্ফুট কণ্ঠে বাসু বললে—অনাচার···এই শাড়ী আর সেমিজ !

—হ্যাঁ। তারপর দুয়ের নম্বর···তোমার ঘরে···

ঘরের ভিতর থেকে শচীর কণ্ঠ শোনা গেল। বাসুকে উদ্দেশ করে শচীর প্রশ্ন—কার সঙ্গে কথা কইছিস ?

—বাচস্পতিদা।

শচীর কণ্ঠ শুনে বাচস্পতি এলেন ঘরের সামনে। আসতেই শচীর সঙ্গে চোখোচোখি। বাচস্পতি দেখেন, শচীর পিছনে কিরণ !···বাচস্পতি নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না। হো-হো অট্টহাস্যে ফেটে পড়বার জো !

এরা তিনজনে অবাক ! শচী বললে—ব্যাপার কি বাচস্পতিদা ? দেখা হতেই এমন হাসি ! পাগল হলে নাকি ?

কোনোমতে হাসির দমক থামিয়ে বাচস্পতি বললেন—পাগলই হয়েছি দিদি ! বলে ঘরের বিছানা এবং আলনায় শাড়ী-সেমিজ···আরশির টেবিলে মাথার কাঁটা, চুলের ফিতা···এগুলোর দিকে দেখিয়ে বাচস্পতি বললেন—তুমি এসেছো এখানে···এ-সব তোমার জিনিষ·· কে বুঝবে, বলো ? এই

সব দেখেই কর্ত্তা একেবারে ক্ষেপে উঠলেন! এখানে এক-মিনিট বসা নয়! মেজাজ একদম খাপ্পা! বাসু ব্যাচিলর-মানুষ··· এখানে একা থাকে···তার বাড়ীতে শাড়ী-সেমিজ! তার ঘরে মেয়েদের সাজগোজ করবার জিনিষ! ব্যস্! তারপর ঐ ফতোয়া জারি!

শচী বললে—কিন্তু তোমাকে নিয়ে বাবা হঠাৎ···

বাচস্পতি বললেন—আরে, এটর্ণি-বংশগোপাল চিঠি লিখে তাঁকে খবর দেছেন, বাসু হঠাৎ তাঁর কাছে গিয়ে কাকুতি-মিনতি করে বারো-বারোশো টাকা এনেছে। শুনে উনি দারুণ চিন্তিত! এখানে বাসু তাহলে···মানে, বাসু কাপ্তেনি সুরু করেছে! তাই খোঁজ নিতে এখানে আসা। এসে বাড়ী ঢুকে দেখেন, ঐ শাড়ী-সেমিজ আর এই সব···হা-হা-হা!

কিরণ হো-হো করে হেসে উঠলো, বললে—রজ্জুকে সর্পভ্রম বলে একেই!

এ-হাসি-তামাসা শচীর ভালো লাগলো না। বাবাকে সে চেনে! এ হুকুম যখন তিনি দেছেন, শচীর মনে দুশ্চিন্তা! শচী বললে—শাড়ী-সেমিজের জন্য আমি ভাবছি না। ঐ বারোশো টাকা···তাছাড়া বাসুকে কালই এখান থেকে চলে যাবার হুকুম দেছেন···

বাচস্পতি বললেন—দাঁড়াও দিদি। মুখ-হাত ধুয়ে আমাকে একটু নিশ্বাস ফেলতে দাও···তারপর আমাকে সব কথা খুলে বলো। দেখি, কোনো রকম ফিকির-ফন্দী···

শচী বললে—সব কথাই বাসু তোমাকে বলবে। বাসু কোনো অপরাধ করেনি! কোনো অনাচার নয়। সব কথা শুনলে তুমি বুঝতে পারবে, বাচস্পতিদা।

জয়গোপালের গৃহে, এঁদের মুখে সে-রাত্রে আর কোনো কথা নেই—শুধু শচীর কথা, কিরণের কথা…আর বাসুর কথা। মা বললেন—শুধু বাসু নয় গো, বাসুর বোন, বাসুর ভগ্নীপতি…সকলেই চমৎকার মানুষ। আমরা কোথাকার কে, তবু কত যত্ন, কত আদর! যেন কতকালের চেনা-জানা কত আপনজন!

জয়গোপাল বললেন—বোনেদী ঘর…ওদের মন দরাজ হবেই তো! টাকার চেয়ে মানুষের দাম বেশী বোঝে! না হলে আমাদের দুঃখে ঐ একরত্তি ছেলে…ভাবো তো এই বারোশো টাকা…

চাঁপা বসে শুনছে…তার মনে যে মেঘ এতকাল ধরে জমে ভারী হয়ে উঠেছে, তার উপর ওঁদের দরদ ভালোবাসা সূর্য্য-কিরণের মতো লেগে রামধনুর সাতটা রঙ ফুটিয়ে তুলেছে যেন!

এখানে খাওয়া-দাওয়ার পর বাচস্পতির সঙ্গে বসে বিশদ কথা।

শচী বললে—শুনলে তো, এ বারোশো টাকা বাসু কেন…

নিশ্বাস ফেলে বাচস্পতি বললেন—হুঁ।

শচী বললে—ওঁদের এরকম বিপদ শুনলে বাবা নিজে বারোশো টাকা দিতেন তখনি। তাঁর ছেলে হয়ে বাসু এ টাকা দেছে… এ-কথা শুনলে বাবা কক্‌খনো রাগ করবেন না, বাচস্পতিদা। তবে বাবাকে না বলে দেওয়া…আমি বলি, তুমি কাল বাড়ী যাচ্ছো তো, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো—গিয়ে বাবাকে সব কথা বুঝিয়ে বলবো।

হেসে কিরণ বললে—তোমার যে শাড়ী আর সেমিজ ঐ বারান্দায় ঝুলছে, ওদুটো আলাদা কাগজে জড়িয়ে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো…তাঁকে

দেখাবে—আইডেন্টিফিকেশন্-এর জন্য। তাহলে আসামী বেকসুর খালাশ পাবে।

বাচস্পতি বললেন—বাসুও যাচ্ছে তো? বলে তিনি বাসুর পানে তাকালেন।

বাচস্পতির সে-দৃষ্টি বাসুকে যেন ছুঁচের মতো বিঁধলো! এখান থেকে যাওয়া? বাপরে! তার মুখে কথা ফুটলো না—অসহায় হতাশ দৃষ্টিতে সে তাকালো শচীর পানে।

বাসুর সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টি শচী লক্ষ্যও করলো না। বাচস্পতির কথার জবাবে শচী বললে—আমি বলি বাচস্পতিদা, বাবার রাগের মুখে বাসুর এখন গিয়ে কাজ নেই। ও এইখানেই থাকুক। আমি গিয়ে বাবাকে বুঝিয়ে আগে ঠাণ্ডা করি, তারপর বাসু…

বাসুর মাথায় ছোট একটা চাঁটি মেরে কিরণ হেসে বললে—বাঃ শালা, বেঁচে গেলি! বিরহ-অনল-তাপ…বলেই কিরণ বাচস্পতির পানে তাকালো, বললে—কিন্তু বাচস্পতিদা, বাসু এখানে বিষম এক মুস্কিল বাধিয়ে বসেছে!

ভ্রূকুটিভরা দৃষ্টিতে বাচস্পতি বললেন—মুস্কিল!

কিরণ বললে—বিষম মুস্কিল! তারপর বাসুর পানে চেয়ে—কি রে, বলবো?

বাসু একেবারে খেঁকিয়ে উঠলো, বললে—যাও! সব-তাতে ইয়াকি। বলেই সে একেবারে বিদ্যুতের মতো ছিটকে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাচস্পতির মনে কৌতূহল। বাচস্পতি বললেন—কি, বলোতো দাদা—ব্যাপারটা রসালো বলে মনে হচ্ছে।

কিরণ বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের শাস্ত্রে যাকে বলে আদিরস!

বাচস্পতির কৌতূহল অদম্য। তিনি বললেন—তার মানে ?

কিরণ বললে—মানে ঐ জয়গোপালবাবুর কথা শুনলেন তো··· তাঁর বিপদে বিগলিত হয়ে তাঁর বন্ধকী-বাড়ী উদ্ধার করা নয় শুধু, তাঁর রূপসী বিদুষী কিশোরী কন্যাটিকে বাসু ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছে !

পরম-উৎসাহে নাকে একটিপ নস্য গুঁজে বাচস্পতি বললেন---বটে ! তাঁর মুখে সরস হাসির রেখা।

শচী তিড়বিড়িয়ে উঠলো। ঝাঁজালো কণ্ঠে প্রতিবাদ তুলে শচী বললে—না, না বাচস্পতিদা, তুমি ওঁর কথা শুনো না। তা নয়। বাসু বলে, হুঁঃ, ওঁদের মতো নাটক-নভেল বোঝে না। তবে···হ্যাঁ, ওঁদের মেয়েটিকে আমার খুব ভালো লেগেছে। ওঁরা খুব ভালো—তবে বড় গরীব। টাকার অভাবে অমন মেয়ে কার হাতে পড়বে···তাই আমার মনে হয়, বাসুর সঙ্গে যদি ওর বিয়ে···তাতে বাধা নেই বাচস্পতিদা··· আমাদের স্বঘর।

গম্ভীর কণ্ঠে বাচস্পতি বললেন—কিন্তু জানো তো দিদি, তোমার বাবার কত রকম খুঁটিনাটির বিচার···শাস্ত্রের বিধি লক্ষণ···

বাধা দিয়ে শচী বললে—মেয়েটিকে বাবা যদি স্বচক্ষে দেখেন, আমি বলতে পারি বাচস্পতিদা, বাবার নিশ্চয় পছন্দ হবে।

বাচস্পতি বললেন—কিন্তু তোমার বাবাকে কি করে দেখাবে, দিদি ? মেয়ে দেখতে তিনি কলকাতায় আসবেন, মনেও হয় না !

কিরণ বললে—তাছাড়া ছেলের বিয়ে দেবার জন্য কি-রকম মেয়ে তিনি চান, জানো তো। খুব সেকেলে বোনেদী ঘরের মেয়ে হবে···মেয়ে লেখাপড়া জানবে না···লজ্জায় জড়সড় হয়ে থাকবে পুঁটলির মতো, সাত চড়ে কথা কবে না ! মেয়ের বয়স হবে সাত-বছর কি আট-বছর—

এতটুকু পুঁচকে···মুখ ঘোমটায় সব সময় ঢেকে রাখবে, একেবারে অসূর্য্যম্পশ্যা ! তার উপর কোষ্ঠীর মিল, রাজযোটক।

শচী বিরক্ত হলো। বাধা দিয়ে সে বললে—তুমি থামো তো! যত সব বাজে কথা···বলে বাচস্পতির দিকে তাকিয়ে আবদারের স্বরে শচী বললে—বাবার আগে আমি বলি, বাচস্পতিদা মেয়েটিকে তুমি একবার নিজের চোখে কাল খ্যাখো। মেয়েটিকে দেখলে তুমি···

.

পরের দিন মেয়ে-দেখায় কোনো অসুবিধা ঘটলো না। মেয়ে দেখে এবং জয়গোপালবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে বাচস্পতির ভালো লাগলো। মেয়ে-দেখার আগে কাল থেকে বাচস্পতিকে শচীর অনুরোধ উপরোধ—মেয়ে যদি পছন্দ হয়, যেমন করে পারো বাচস্পতিদা, এ বিয়ের ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে! তোমার মাথায় খুব বুদ্ধি খেলে! তুমি ঠিক বাবাকে বুঝিয়ে বাবার মত করাতে পারবে।

শচীর গে অনুরোধ—তার উপর মেয়েটিকে ভালো লাগা··· বাচস্পতির মন সক্রিয় হয়ে উঠলো। তিনি বললেন—হুঁ···

জয়গোপালকে বাচস্পতি বললেন—আপনার মেয়ে পছন্দ হবে। তবে কর্ত্তা, মানে, সব কথা আপনাকে খুলে বলি। একালে থেকেও কর্ত্তা যেন সেকালের আবহাওয়ায় বাস করছেন! জপ-তপ পূজা-আহ্নিক এ-সব তো আছেই। হিন্দুয়ানি বজায় রাখতে আচার-নিষ্ঠায় তিনি এত-রকম বিধি-নিষেধ মেনে চলেন, আপনি তার ধারণা করতে পারবেন না! যেমন···বলি—ওঁর বিশ্বাস, শরীরং ব্যাধিমন্দিরং। শরীর যখন ধারণ করছি, তখন সে শরীরে নানা ব্যাধি থাকবেই। এই ধারণায় দিনে সতেরো রকমের রোগের অনুযোগ আর অভিযোগ ওঁর।

বাধা দিয়ে শচী বলে উঠলো—হ্যাঁ। বাবাকে এত বোঝাই, বলি, তোমার বাতিক! বাবা বলেন, না রে! আমরা বলি, তা বেশ, তাই যদি তো পাশকরা ডাক্তার দেখাও। বাবা দেখাবেন না। এ্যালোপাথি ওষুধ বাবা ছোঁবেন না! বলেন, ম্লেচ্ছাচার! ওঁর দাতব্য চিকিৎসালয় আছে···সেখানে মাহিনা-করা হাতুড়ে কবিরাজ—সেই কবিরাজ ধুলো বালি সুরকি যা দেবে, উনি খাবেন। আশ্চর্য্য বাতিক!

বাচস্পতি বললেন—সব বিষয়ে। ছেলের বিয়ে দেবেন—তার জন্য মেয়ে···সেখানেও উৎকট সেকেলেপনা! কন্যা হবে অষ্টম-বর্ষীয়া গৌরী। তাঁর বিশ্বাস, এই সব আচার-বিচার লোকে মানছে না বলেই আমাদের হিন্দুধর্ম্মটা লোপ পেতে বসেছে।

নিশ্বাস ফেলে জয়গোপাল বললেন—তাহলে দুরাশা। নাহলে বাসুদেবকে পাওয়া···

নাকে নস্য গুঁজে বাচস্পতি বললেন—আ-হা-হা-হা নিরাশ হচ্ছেন কেন? আমাদের শাস্ত্রে বলেছে—উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।

জয়গোপাল বললেন—কিন্তু সে উদ্যোগ আমার মতো লোকের পক্ষে···

শচীর উপর চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে বাচস্পতি বললেন—মানে, একটু কূটনীতির আশ্রয়।

বিস্ময়ে জয়গোপালের দু'চোখ বিস্ফারিত। তিনি বললেন—কূটনীতি!

বাচস্পতি আর-এক টিপ নস্য নিলেন; নিয়ে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার দিদি একটা প্রস্তাব করছিলেন···বলে বাচস্পতি তাকালেন শচীর দিকে—কি দিদি, বলো···

ঈষৎ সলজ্জকণ্ঠে শচী বললে—আপনি আমার বাবার মতো বলেই বলছি।...উনি আজ শিলং চলে গেলেন...আমি রাত্রের ট্রেনে বাচস্পতিদার সঙ্গে রাধানগরে যাচ্ছি বাবার কাছে। তাই, মানে, আমি বলি, আপনারা যদি আমাদের সঙ্গে রাধানগরে যান? তবে...বলে শচী তাকালো বাচস্পতির দিকে।

বাচস্পতি বললেন—হ্যাঁ, মানে, একটু কূটনীতি! সেখানে আপনি সস্ত্রীক আমার বাড়ীতে থাকবেন আর আপনার কন্যা থাকবেন কর্ত্তার ওখানে আমার এই দিদির সঙ্গে...এঁর হেফাজতে।

জয়গোপাল এবং তাঁর স্ত্রী এ-কথার মর্ম্ম বুঝলেন না। তাঁরা কেমন হতভম্ব!

শচী বললে—মানে, তাহলে শুধু চোখে দেখা নয়, চাঁপার পরিচয় বাবা ভালো করেই পাবেন।

বাচস্পতি বললেন—এতে ঐ একটু কূটনীতি! অর্থাৎ এটুকু করতে পারলেই অষ্টমা-গৌরীর বদলে অষ্টাদশী-গৌরীকে বরণ করে নিতে কর্ত্তার আর কোনো দ্বিধা থাকবে, বলে মনে হয় না।

বিস্ময়-বিমূঢ়ের মতো জয়গোপাল বললেন—কিন্তু আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

বাচস্পতি বললেন—বুঝিয়ে দেবো—সব বুঝতে পারবেন। আপনি রাজী হন—অমত করবেন না। আপনাদের কারো এতটুকু মর্য্যাদা-হানি হবে না—বিশ্বাস করুন।

চিন্তাকুলভাবে জয়গোপাল শুধু বললেন—হুঁ।

সকলে চুপচাপ। নিঝুম নিস্তব্ধ চারিদিক...হঠাৎ হুড়মুড় করে একটা শব্দ। ওঁরা চমকে উঠলেন—চমকে সেই শব্দ লক্ষ্য করে বাহিরে পথের দিকে তাকালেন। চাঁপা ছিল ঘরে কপাটের আড়ালে—শব্দ শুনে

চকিতা হরিণীর মতো সে ছুটলো বাগানে···পথের ধারের পাঁচিলের দিকে। গিয়ে যা দেখলো···

পাঁচিলের ওধারে পথে বাসু গেছে পড়ে···পাঁচিলের খানিকটা ইট খশে ধ্বশে গেছে। দেখে চাঁপা বললে—আপনি এখানে···

উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে বাসু বললে—হ্যা। মানে, পাঁচিলের ধারে গাছটায় কি-সুন্দর একটা কাঠ-বিড়ালী···

এটুকু বলে···পাছে সকলের কাছে ধরা পড়ে···বাসু আর এক-মিনিট দাঁড়ালো না, ছুটে চলে গেল।

চাঁপা অবাক হয়ে তার পানে চেয়ে···চাঁপার মনে কত-কি···

১৪

তারপর জল্পনা পরামর্শ। বাচস্পতি বোঝালেন জয়গোপাল এবং তাঁর স্ত্রীকে—বেশী কিছু নয়! চাঁপাদিদি থাকবেন শচীদির সঙ্গে কর্ত্তার বাড়ীতে···শচীর সঙ্গে কর্ত্তার একটু সেবা-পরিচর্য্যা··· গৃহিণী মারা যাওয়া ইস্তক বাড়ীর শ্যামসুন্দর-বিগ্রহের সেবা মাহিনা-করা বামুন-পুরোহিতের হাতে···ও বিগ্রহ কর্ত্তার ধ্যান-জ্ঞান-প্রাণ··· তাঁর সেবায় কী সজ্জা-সমারোহই না ছিল! এখন মাহিনা-করা লোকের হাতে কোনোদিন পূজার পাত্র সাফ হয়, কোনোদিন বা হয় না! পূজার ফুল তুলসীপত্র···সব সময়ে তাজা মেলেনা···মানে, একটু আধটু বিশৃঙ্খলা···কর্ত্তার মন হয় অপ্রসন্ন···বকাবকি করলে দুচার দিন এর ব্যতিক্রম···তারপর আবার যেমন, তাই! কর্ত্তা আর পারেন না! মন খুঁতখুঁত করে! কিন্তু উপায় কি! তাই মানে, চাঁপাদিদির যে পরিচয় পাওয়া গেল···চমৎকার শ্লোক উচ্চারণ করেন···ফুল তোলা,

ঠাকুরের পূজার আয়োজন—এ সবে মন আছে···নৈপুণ্য আছে··· চাঁপাদিদি যদি ঐ বিগ্রহ সেবার আয়োজনেও···অর্থাৎ বুদ্ধিমতী মেয়ে··· দেখতে ভালো···এমনি পাঁচ কাজে কর্ত্তার যদি মনে লাগে, শচীদিদির সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন তো বোনের মতো···

জয়গোপালকে বাসু সভ্য এত-বড় দায়ে-মুক্ত করেছে—তার উপর অকস্মাৎ বাসুর দিদি, ভগ্নীপতি এবং বাচস্পতি মশায়ের এমন অযাচিত প্রীতি-মমতা···এ যেন বিধাতার কৃপা! স্ত্রী বললেন জয়গোপালকে, —এঁদের এত স্নেহ, এমন দরদ···আমার মন বলছে।

আর চাঁপা? কৃতজ্ঞতায় বাসুর পায়ে নিজের মনকে সে লুটিয়ে দেছে···তারপর কোথা থেকে এলো শচী···চাঁপার উপর শচীর কী মমতা! বাঙালী-ঘরের মেয়ে···ডাগর হয়েছে···বোঝে স্বামী, শ্বশুরের ঘর, সংসার, মেয়েদের ইহজন্মের একমাত্র কামনা···একটিমাত্র আশ্রয়! কাজেই যাওয়া স্থির হলো···

ট্রেণের কামরায় বাচস্পতি আরো বোঝালেন, চাঁপাদিদির সেখানে সেবা-পরিচর্য্যা···তার সঙ্গে একটু অভিনয়···রঙ্গমঞ্চে নয়···সংসারে!

বাচস্পতি বললেন—আমাদের জীবনটাই তো নাটক! আর এ পৃথিবী হলো নাট্যশালা! চাঁপাদিদির ভূমিকা···এ-নাটকে শচীদিদি আর আমি মিলে রচনা করবো শচীদিদি ওঁকে শিখিয়ে দেবেন অভিনয়ের ভঙ্গী! আপনাদের হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে, বুঝছি। কিন্তু এ নাটক-রচনায় আপনাদেরও সঙ্গে নেবো আলোচনা-পরামর্শ করতে, তখন কোথাও হেঁয়ালি ঠেকবে না।

রাধানগর ষ্টেশনে নেমে চাঁপা, জয়গোপাল আর তাঁর স্ত্রীকে নিজের

বাড়ীতে নামিয়ে তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে শচীকে নিয়ে বাচস্পতি এলেন মথুরামোহনের গৃহে।

বাচস্পতির সঙ্গে শচীকে দেখে মথুরামোহন অবাক! বাপকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলা নিয়ে শচী বাপকে জড়িয়ে ধরলো।... এই স্নেহের স্পর্শ...মথুরামোহনের তপ্ত প্রাণে আরাম বুলিয়ে দিলে! তিনি বললেন—তুই কোথা থেকে হঠাৎ বাচস্পতির সঙ্গে?

শচী বললে—বা রে, আমি তোমার জামাইয়ের সঙ্গে দু-চারদিন আগে বাসুর ওখানে এসে উঠেছিলুম। অফিসের কাজে ওঁকে শিলং যেতে হবে, আসছিলেনও...আমিও ওঁর সঙ্গে...শচী বললো তার কানপুর থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসার বৃত্তান্ত। তারপর একটু অভিমানের সুরে বললে—তুমি সেই দক্ষিণেশ্বরে গেলে, অমন করে চলে এলে যে! আশ্চর্য্য! বাচস্পতিদার কাছে শুনলুম বারান্দায় শাড়ী-সেমিজ শুকোচ্ছে দেখে আর ঘরে আমাদের জিনিষপত্রর দেখে যা-তা ভেবে রাগে তুমি আগুন! মধু-টধুকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করা নয়! জিজ্ঞাসা করলে তারা বলতো সব কথা। তোমার জামাইয়ের সখ হলো পূর্ণিমা রাত...বললে, চলো, একখানা পান্সি নিয়ে গঙ্গায় খানিক ঘুরে আসি!...আমাদের ফিরতে একটু রাত হয়েছিল! তা বলে ও মা, তুমি একেবারে...

বাচস্পতি বললেন—মানে বুঝছো না দিদি! সেই যে কথা আছে, পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ! পাহাড়ে ধোঁয়া—উনি ভাবলেন, পাহাড়ে আগুন লেগেছে!

সেই শাড়ী আর সেমিজ কাগজে-জড়ানো প্যাকেটে ছিল শচীর হাতে, প্যাকেট খুলে শাড়ী-সেমিজ দেখিয়ে শচী বললে—এই সেই শাড়ী আর সেমিজ।

মথুরামোহন সব কথা শুনলেন...তারপর নিশ্বাস ফেলে বললেন—হুঁ।

কি জানিস্, ঐ বংশগোপালের চিঠি···বারোশো টাকা নেছে বাসু তার কাছ থেকে! আমি চমকে উঠলুম···কেন? তাই বাচস্পতিকে নিয়ে এই রোগা শরীরে···দক্ষিণেশ্বরে ছুটলুম। গিয়ে দেখি, বাড়ীতে বাসু নেই···মধু নেই···কেউ নেই! মেজাজটা কেমন···কি করে জানবো, তুই আর কিরণ হঠাৎ এসে ওখানে উঠেছিস!

হেসে বাচস্পতি খানিকটা নস্য গুঁজলেন নাকে। মৃদু হেসে শচী বললে—তাহলেও বাবা বাসুকে অমন···তোমার ছেলে···তুমি তার নাড়ী-নক্ষত্র জানো···সে এমন বিগড়ে যাবে এ-কথা তোমার মনে হলো কি করে?

আর একটা নিশ্বাস ফেলে মথুরামোহন বললেন—সে তুই বুঝবি নে মা! কলকাতায় সব দিকে অনাচার···বাসু এখানে কতখানি ধরা-বাঁধার মধ্যে মানুষ হচ্ছে! সেখানে ঐ অনাচারের মধ্যে ছেলেকে পাঠিয়ে মনে সব সময়ে কি রকম···আর একটা নিশ্বাসে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হলো। নিশ্বাস ফেলে আবার বললেন—আমাদের চিরকালের এ সনাতন আচার নিষ্ঠা···

বাচস্পতি বলে উঠলেন—ঐ বারোশো টাকা···বাসু হঠাৎ এ টাকাটা···

মথুরামোহন বললেন—হুঁ।

শচী বললে—জানি। আমরা দক্ষিণেশ্বরে আসতেই বাসু আমাদের এ টাকা নেবার কথা বলেছে। বন্ধকী দায়ে ওখানকার এক ভদ্রলোকের বাড়ী লাটে বিক্রী হচ্ছিল। মেয়ের বিয়ে দিতে তিনি ভিটে বন্ধক দিয়েছিলেন। সে-মেয়ে বিয়ের ক-মাস পরে মারা যায়। ভদ্রলোক বাড়ী উদ্ধার করতে পারেননি। পাড়ায় থাকেন···বাড়ী গেলে পথে বসবেন শুনে বাসু ও টাকাটা এনে···তোমাকে লিখে টাকা চাইবে, তার সময় ছিল না বলেই···

শচীর মুখের কথা লুফে নিয়ে বাচস্পতি বললেন—মহাপুণ্য! এ ক্ষেত্রে দান···এর নজীর পাই আমাদের পুরাণে দধীচির অস্থি-দান··· কুন্তীপুত্র কর্ণ···রাজা হরিশ্চন্দ্র! আপনার বংশও এ-রকম দানের জন্ম প্রসিদ্ধ! আপনার ছেলে বাসু···মানুষের এমন বিপদ শুনে সে যদি এ সাহায্য না করতো, তাহলে বংশের কতখানি কলঙ্ক!

মথুরামোহন নির্বাক! তাঁর মনে চিন্তার ঘূর্ণি! তিনি ডাকলেন—বটা···

বটা ছিল ঘরের ঠিক বাহিরে···কর্ত্তার ডাকে ঘরে এলো।

তার পানে চেয়ে মথুরামোহন বললেন—নায়েব মশায়ের কাছে যা এখনি···গিয়ে তাঁকে বলবি, কলকাতার এটর্ণিবাবুকে যে বারোশো টাকা পাঠাবার কথা একটু আগে বলেছি, সে-টাকা যেন আজই পাঠানো হয়।

—যে আজ্ঞে। বলে বটা চলে যাচ্ছিল, মথুরামোহন বললেন—হ্যাঁ, আর শোন্···

বটা তাঁর পানে ফিরে তাকালো। মথুরামোহন বললেন—আরো তাঁকে বলবি, এ টাকাটা খয়রাতী-খাতে লেখা হবে। বুঝেছিস?

—আজ্ঞে। বলে বটা চলে গেল।

মথুরামোহন তাকালেন শচীর দিকে—বাসু? সে আসে নি?

বাচস্পতির দিকে দৃষ্টির একটু ঝলক বুলিয়ে মথুরামোহনের পানে তাকিয়ে শচী বললে—আসছিল···তোমার কড়া হুকুম। আমি বললুম, বাবা কিছু না জেনে রাগ করেছেন, তাই যেতে লিখেছেন। বললুম—আমি বাবাকে সব কথা বলে বুঝোতে পারবো···তোকে এখন যেতে হবে না। বাবা বুঝবেন। তাছাড়া তার বুঝি আর দু'চার দিন পরে কি-একটা এগজামিন।

মথুরামোহন বললেন—ও।

শচী বললে—তোমার রাগ গেছে তো?

একটা নিশ্বাস ফেলে মথুরামোহন জানালেন—হাঁ।

বাচস্পতি তাকালেন মথুরামোহনের দিকে, বললেন—একটা সমস্যা··· এখান থেকে আপনার সঙ্গে বেরুচ্ছি সেদিন···ঐ দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্য এমন সময়···বিপত্তি!

মথুরামোহনের দৃষ্টিতে কৌতূহল। তিনি তাকালেন বাচস্পতির দিকে। বাচস্পতি বললেন—যা বললেন, তার মর্ম্ম···চাঁপার সম্বন্ধে বাচস্পতির রচিত অপূর্ব্ব একটি কাহিনী! অর্থাৎ বাচস্পতির বিশেষ-জানা এক ভদ্রলোক—পরম সাধক···ঘোর সনাতনপন্থী···নানা তীর্থে ঘুরে নানা সাধু ও শাস্ত্রজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করে সমাজে সনাতন আচার-নিষ্ঠার উপকারিতা বুঝিয়ে প্রকাণ্ড এক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর একটি কন্যা আছে। কন্যাটির বয়স আঠারো-উনিশ বছর···সেই কন্যাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোতে সম্প্রতি তাঁর বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে। তাঁর এই কন্যাটিকে বাচস্পতির কাছে পাঠিয়েছেন···সে-কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার··· বিশেষ, দুরন্ত যৌবন-কাল···অর্থাৎ কন্যাটি বড় ভালো···আমাদের সনাতন আচার-নিষ্ঠায় শ্রদ্ধাবতী, পূজার্চ্চনার কাজে পটু···বাচস্পতি বললেন, তাঁর কোথায় সে সামর্থ্য, এ কন্যার ভার নেবেন! মথুরামোহনকেই এ ভার নিতে হবে এবং কন্যার পিতা বাচস্পতিকে বিশেষ-অনুরোধ জানিয়েছেন, মথুরামোহনকে বলে-কয়ে তাঁর এ কন্যার জন্য আশ্রয়···

এ কাহিনীটুকু বাচস্পতি কলা-রসিকের মতো বেশ পল্লবিত করে শোনালেন।

শুনে মথুরামোহন বললেন—মেয়েটি বাঙালী?

বাচস্পতি বললেন—আজ্ঞে, হ্যাঁ। তিন-পুরুষ ধরে এঁদের বৃন্দাবনে বাস। ব্রাহ্মণ।

—কুমারী? তোমার জানা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মেয়েটিকে আমি···সেবারে যখন বৃন্দাবনে যাই, দেখেছিলুম। মেয়েটির বাবা মা···সকলকেই আমি জানি···বড় ভালো।

—তা এতকাল পরে হঠাৎ আজ তোমার এখানে ?···

—মানে, আপনার নাম করেই অনুরোধ। আপনার নাম শুনেছেন এঁরা। আপনার মায়া-মমতা আচার-নিষ্ঠা···আমি যখন বৃন্দাবনে যাই, আমার মুখে শুনেছিলেন, আপনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। আপনার বহু গুণের কথা আমার মুখেই শুনেছেন। তাই আপনার এখানে মেয়েটির নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য···মানে, আপনার শ্যামসুন্দরের সেবা করবে, তাছাড়া আপনাকে দেখা-শুনা···

মথুরামোহনের মনে চিন্তার আলোড়ন···বাচস্পতি তাঁর পানে একাগ্র-দৃষ্টিতে চেয়ে···মথুরামোহন বললেন—মেয়েটির বয়স বললে, আঠারো-উনিশ বছর ?

শচী বলে উঠলো—ও, তাহলে তো খুব ভালো !···হ্যাঁ বাবা, মেয়েটিকে তুমি তোমার কাছে এনে রাখো ! বেচারী ! তাছাড়া আমি তোমার কাছে থাকি না···বাসুও কাছ-ছাড়া···বাচস্পতিদা থাকলেও তোমার এই বয়স, শরীরে একটা-না-একটা উপসর্গ লেগেই আছে···এমন একটি মেয়ে যদি দেখাশুনা করে···এই পর্য্যন্ত বলে শচী তাকালো বাচস্পতির দিকে, বললে—তুমি কি বলো, বাচস্পতিদা ?

নাকে একটিপ নস্য গুঁজে বাচস্পতি বললেন—নিশ্চয়। সেবার কাজে মেয়েরা যেমন···শাস্ত্রে বলেছে, ষোড়শী কুমারী কন্যা সেবায়াং জননীসমা।

সংস্কৃত শ্লোক শোনবামাত্র মথুরামোহন তাকালেন বাচস্পতির দিকে, বললেন—হুঁ। মেয়েটিকে তাহলে দেখতে হয়।

বাচস্পতি বললেন—সে আর শক্ত কথা কি ! আমার ওখানে তিনি···

মথুরামোহন কি বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে শচী বলে উঠলো—তাহলে আজই বিকেলে এখানে নিয়ে এসো, বাচস্পতিদা।

মথুরামোহনের দৃষ্টি পলকহীন…বাচস্পতির মুখে নিবদ্ধ…তিনি বললেন—বেশ।

বাচস্পতির গৃহ। রোয়াকে জয়গোপাল এবং বাচস্পতি। কতকগুলো শিশি-বোতল থেকে ওষুধপত্র বার ক'রে বাচস্পতি সেগুলো মাটীর ঢাকনিওয়ালা পাত্রে ভরছেন—জয়গোপাল নিঃশব্দে বসে দেখছেন… বাচস্পতি বললেন—কোনো দুশ্চিন্তা করবেন না, এ ছলনায় অন্যায় কিছু নেই। আপনি নিঃসংশয়ে আমরা যা বলি, তা শুনুন। মানে, আমাদের কর্ত্তা কেমন জানেন? যেন ডাব…বাইরের খোলটা শক্ত…ভিতরে শাঁস আর জল…

জয়গোপাল কেমন যেন হতভম্ব…তাঁর মুখে কথা নেই! দমকা বাতাসের মতো শচী এসে হাজির! এসেই শচী বললে—কি করছো বাচস্পতিদা? তোমার এখনো হলো না?

বাচস্পতি বললেন—এই যে, আর দেরী নেই!

শচী বললে—কিন্তু আমি আর এখানে থাকতে পারছি না। বাবাকে লুকিয়ে কখন এসেছি, বলোদিকিনি? বাবা যদি খোঁজ করেন?

বাচস্পতির ঢালাঢালির কাজ শেষ হলো। মাটীর পাত্রগুলো কাগজে জড়িয়ে তিনি দিলেন শচীর হাতে—সেগুলো নিয়ে শচী পুরলো একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে; তারপর ব্যাগটা হাতে নিয়ে আঁচল-চাপা দিয়ে শচী বললো—তুমি তাহলে চাঁপাকে নিয়ে এসো। আমি এগুই।

বাচস্পতি বললেন—হ্যাঁ। দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা গিয়ে দরবারে হাজির হবো।

বাড়ীর-লাগাও বাগানে পাথরের বেদীতে বসে মথুরামোহন···পাশে শচী। বেদীর পিছনে শান্ত্রী-পাহারার মতো বটা আছে খাড়া··· চাঁপাকে এনে বাচস্পতি চিনিয়ে দিলেন। বললেন—এই সে মেয়েটি। আপনাকে বলেছি সেই, এঁর বাবা আমাদের সনাতন সমাজে আর্য্য আচার নিষ্ঠার উপকারিতা বুঝিয়ে বিরাট গ্রন্থ লিখেছেন। তিনি নিজে আমাদের সনাতন আচার-নিষ্ঠা বৈদিক ঋষির মতো মেনে চলেন।

মথুরামোহন সন্ধানী দৃষ্টিতে চাঁপাকে পরীক্ষা করলেন···ডাক্তার যেমন অনুবীক্ষণ-যন্ত্রে রোগের ব্যাসিলি পরীক্ষা করে, তেমনি ভাবে। তাঁর নজরে পড়লো, চাঁপার পায়ে নাগরা জুতো! মথুরামোহন যেন শিউরে উঠলেন, বললেন—পায়ে জুতো।···এ তো আমাদের সনাতন-প্রথা নয়, বাচস্পতি! না···

বাচস্পতি তাকালেন চাঁপার পায়ের দিকে···ইঃ! পরক্ষণেই তাঁর দৃষ্টি শচীর পানে···চকিতের জন্য! দেখলেন, শচী একেবারে কাঁটা!

বাচস্পতি চট্ করে জবাব খুঁজে পেলেন না। তিনি বললেন—তাইতো ভাই! বলে তিনি চাঁপার পানে তাকালেন।

সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত সলজ্জ বিনম্র ভাষায় চাঁপা বললে—ছেলেবেলা থেকে···

কথার এই টুকরোটুকু বাচস্পতির মনে যেন শলাকার স্পর্শ! বাচস্পতি চট্ করে বললেন—অভ্যাস! ঠিক! ঠিক! ইনি পশ্চিম থেকে আসছেন। সেখানে যেমন রীতি। পশ্চিমে এখনো সেই আর্য্য প্রথা, পাদুকা! হুঁ···কি একখানা·· প্রাচীন পুঁথিতে পড়েছি···বলেই তিনি আওড়ালেন স্বরচিত শ্লোক। এ-কাজে বাচস্পতির অসাধারণ পটুতা···। বাচস্পতি আওড়ালেন···

আতপ-তাপে দহতি তব চরণম্‌
কুরু পাদুকা-মণ্ডিতম্‌, রাধে !

সঙ্গে সঙ্গে সস্মিত কণ্ঠে শচী বলে উঠলো—ও, তাই অমরনাথ কেদার-বদরী…এ-সব তীর্থে যেতে সকলে জুতো পায়ে দেয়…না ?

মাথা নেড়ে বাচস্পতি বললেন—হ্যাঁ।

বাচস্পতির এ-কথা মথুরামোহনের মনে তেমন না লাগলেও ঐ শ্লোক।…সংস্কৃত শ্লোকের উপর তাঁর বিরাট শ্রদ্ধা…মথুরামোহন শুধু বললেন—হুঁ।

বাচস্পতি বুঝলেন, সংস্কৃত শ্লোক সত্বেও মথুরামোহন তেমন খুশী হলেন না! অতএব বাচস্পতি তাকালেন চাঁপার দিকে, বললেন—তা এ যখন পশ্চিম নয়, বাংলাদেশ, তখন এদেশের আচার মেনে জুতোজাড়া তুমি ত্যাগ করো, দিদি।…পারবে না ?

নতশিরে সলজ্জ হাসিমুখে চাঁপা বললে—হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে পায়ের নাগরা খুলে সে-জোড়া পা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে রাখলো।

দেখে শচী বাপের পানে চেয়ে বললে—এই তো বাবা, তুমি পছন্দ করো না…মেয়েটি জুতো খুলে ফেললে।

মথুরামোহন দেখলেন…দেখে খুশী হলেন…বললেন—হুঁ।

শচী বললে চাঁপার পানে চেয়ে—তাহলে…

চাঁপার উপর একাগ্র দৃষ্টি…মথুরামোহন তখনো তাকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করছেন। নিশ্বাস ফেলে মথুরামোহন বললেন—বেশ। তাহলে বাচস্পতি, এখানেই উনি থাকুন!

১৫

ঐদিনই সন্ধ্যার পর একান্তে বসে চাঁপাকে তার ভূমিকা বুঝানো···

বাচস্পতি বোঝালেন, কর্তার এই যে নানা রোগের উপসর্গ···এগুলো ঠিক রোগ নয়—বাতিক! চিরদিন সনাতনপন্থী কিন্তু পনেরো-ষোল বৎসর যাবৎ অর্থাৎ পত্নী-বিয়োগের পর থেকে ওঁর মনে সনাতনী ধারণা ক্রমেই মাত্রা ছাপিয়ে বেড়ে চলেছে! গৃহিণী মারা যাবার সময় কর্তার কোন্ বন্ধু অন্তিম সময়ে জোর করে কলকাতা থেকে সাহেব-ডাক্তার আনিয়েছিলেন—তখন নিদান-কাল—ডাক্তার একেবারে অক্সিজেন দেবার সরঞ্জামপত্র নিয়ে উপস্থিত। কিন্তু গৃহিণী তখন এ-পারের ঘাট ঝেড়ে পারের নৌকোয় উঠেছেন···অক্সিজেনের সাধ্য কি, সে নৌকো ফিরিয়ে তাঁকে নামাবে! সাহেব-ডাক্তার এসে তোড়জোড় করতে-না-করতে গৃহিণীর মৃত্যু! সেই থেকে কর্তার বিশ্বাস, তাঁর সনাতনীতে ঐ ম্লেচ্ছ ডাক্তারের আবির্ভাব···সেই পাপে গৃহিণী বিদায় নেছেন! নানা যুক্তিতেও তাঁর এ বিশ্বাস এতটুকু টলেনি! এবং সেই থেকে সনাতনীর দিকে মন যেন উল্টো ঘোড়ায় চড়ে পিছু হঠতে হঠতে সত্য-ত্রেতাযুগ ডিঙুতে চলেছে! তার উপর বিয়ের পর শচীদিদি গেলেন দূরে চলে—ছেলে বাসু ড্যাগর হয়ে উঠলো! শ্যামসুন্দরের সেবা··· মাহিনা-করা লোকের হাতে পূজার আয়োজন···না আছে পারিপাট্য, না কোনো শ্রী! কাজ নেই, কর্ম্ম নেই—একা মানুষ···গৃহিণীর বিয়োগবেদনা ···মনে সব সময়ে কেমন অস্বস্তি এবং অস্বাচ্ছন্দ্য! এই সব থেকে যেমন হয়, কখনো ভাবেন, এখানটা টনটন করছে, ওখানটা যেন কেমন···তা যদি, বেশ, চিকিৎসা করান, রীতিমত ওষুধপত্র। তা নয়! বাড়ীর কবিরাজ আছেন···তাঁর কোনো শিক্ষা নেই···ওঁর কবিরাজ-

বাবা ছিলেন চিকিৎসক…বাপ মারা যেতে ছেলে উত্তরাধিকার-সূত্রে বাপের গদি দখল করে কবিরাজ বনেছেন! এত বলা হয়, অম্বল হয়েছে, সোডা খান! উদরে বায়ু, কোনো হোমিওপ্যাথি ওষুধ! উঁহু…ম্লেচ্ছ ঔষধ…অনাচার…ধর্ম্মভ্রষ্ট! তাই…

বাচস্পতি বললেন—ওঁর সেবার ভার তোমাকে নিতে হবে। যখন উনি বলবেন, পরিপাকটা কেমন…অমনি ওঁর কবিরাজী সুরকি-চূর্ণ নয়—এই সোডা-মিন্ট ট্যাবলেট…সনাতনী বড়ি বলে খলে গুঁড়িয়ে তাতে জল মিশিয়ে ওঁকে খাওয়াবে! তারপর বার্লি! উনি কিছুতে খাবেন না! বলেন, বিলাতী যন্ত্রে তৈরী…স্পর্শ করলে ধর্ম্মভ্রষ্ট! তোমাকে সেই বার্লি খাওয়াতে হবে। বার্লি বলবে না—একটা সনাতনী নাম দিয়ে চলানো। মানে, যেমন যেমন ঘটবে, আমার শচীদিদি আর আমি ঠিকঠাক বাতলে দেবো। এতে কোনো দোষ নেই, দিদি। তুমি বলবে, মিথ্যা…ছলনা! কিন্তু এতে কোনো অনিষ্ট হবে না…ধর্ম্মেও এতটুকু চিড় খাবে না। এতে উপকার পাবেন উনি…এইটেই তোমার তপস্যা। মানে, শিবকে পাবার জন্য পার্ব্বতী এর চেয়ে বহু-কঠোর কৃচ্ছ্র-সাধন করেছিলেন। তার তুলনায় তোমার এ সাধনা…

চাঁপা একাগ্র মনে শুনছে…তার মুখে একটি কথা নেই।

বাচস্পতির কথার খেই ধরে শচী বললে চাঁপার দিকে চেয়ে—হ্যাঁ… আসল কথা, যেমন করে হোক, বাবার মনখানি তোমাকে দখল করতে হবে।…দখল করা খুব শক্ত নয়…বিশেষ, বাবাকে এখানে দেখবে শুনবে বা ওঁর সেবা-যত্ন করবে…এমন দরদী আত্মীয় একটি মেয়ের যখন অভাব! শুনলে তো বাচস্পতিদার কথা, এতে অন্যায় হবে না… ভয়েরও কিছু নেই। এখন এসো, মন্দিরে যাই। এখনি আরতি হবে…ঐ তসরের শাড়ীখানা পরে এসো। তারপর যেমন-যেমন আমরা বলেছি।

চাঁপাকে এ-কথা বলে শচী তাকালো বাচস্পতির দিকে, বললে—তুমি এগোও বাচস্পতিদা···বাবা এতক্ষণে মন্দিরে গেছেন। আমরা এখনি আসছি।

•

বাগানের প্রান্তে শ্যামসুন্দরের মন্দির···মন্দিরের দ্বারের সামনে বারান্দায় আসন পেতে মথুরামোহন বসে···পাশে বাচস্পতি···মন্দিরের মধ্যে পুরুত-ঠাকুর আরতির পঞ্চপ্রদীপ জ্বালছেন—দুজন মাহিনা করা ব্রাহ্মণ বিগ্রহের দু-পাশে দাঁড়িয়ে···একজনের হাতে চামর, আর একজনের হাতে শঙ্খ! শ্যামসুন্দরের ধ্যানে আধ-নিমীলিত নেত্রে বিগ্রহের পানে চেয়ে মথুরামোহন···মনে অস্বস্তির কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করছে··· দেবতার মুখে কোথায় সে হাসির দীপ্তি? গৃহিণী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের মুখের সে-দীপ্তিও নিবে গেছে! বাচস্পতি একাগ্রভাবে কর্ত্তাকে নিরীক্ষণ করছেন!

চাঁপাকে নিয়ে শচী এসে দাঁড়ালো কর্ত্তার ঠিক পিছনে। পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালা হলো···সে প্রদীপ হাতে পুরুত দাঁড়ালেন আরতি করতে··· তাঁর একহাতে পূজার ঘণ্টা সে-ঘণ্টা নেড়ে। বিগ্রহের পাশে চামর দুলোনো—সেই সঙ্গে শঙ্খধ্বনি। মন্দিরের বাহিরে দাঁড়িয়ে বটা ডাণ্ডা পিটে হাতঘড়ি বাজাচ্ছে ঢং ঢং, ঢং ঢং, ঢং ঢং! মন্দিরে বিগ্রহের সামনে প্রকাণ্ড ধুনুচি—মাহিনা-করা বামুন চামর ধরে দাঁড়াবার আগে ধুনুচিতে একমুঠো ধুনো দেছে···সে ধুনো জমে খানিকটা ঘন ধোঁয়া···

চাঁপাকে ইঙ্গিত করে তাকে নিয়ে শচী ঢুকলো মন্দিরের মধ্যে··· শচীর ইশারায় চাঁপা ধুনুচি সাফ করে তাতে ধুনোর গুঁড়ো ছিটুতে লাগলো···শচী জ্বালালো কতকগুলো সুগন্ধি ধূপ···

আরতি চলেছে। মথুরামোহনের চোখ ভক্তির ভাবে মুদ্রিত।

আরতি শেষ হলে সাষ্টাঙ্গে সকলে বিগ্রহকে প্রণাম করলেন। প্রণামের পর মথুরামোহন তাকালেন চাঁপার দিকে…তখনো চাঁপার প্রণাম শেষ হয়নি।

চাঁপার প্রণাম শেষ হলে মথুরামোহন ডাকলেন চাঁপাকে—মা…

চাঁপা তাকালো মথুরামোহনের দিকে। মথুরামোহনের দৃষ্টিতে প্রসন্নতা। মথুরামোহন বললেন—আমি ভারি খুশী হয়েছি, মা। তুমি নিজে থেকে ঠাকুরের সেবা…

বাচস্পতি বলে উঠলেন—এ-সব মেয়েদের কাজ! আজ চমৎকার ধুনো দেওয়া হয়েছে!

মথুরামোহন বললেন চাঁপাকে—তুমি পূজোর কাজ জানো?

মাথা নেড়ে চাঁপা জানালো, হাঁ…তার পরই চাঁপার দৃষ্টি পড়লো শচীর দিকে…শচীর চোখে ইশারা…বিনম্র ভঙ্গীতে চাঁপা বললে মথুরামোহনকে—আমি একটা কথা বলবো?

সস্নেহ কণ্ঠে মথুরামোহন বললেন—বলো মা, বলো।

চাঁপা বললে—মন্দিরে এই পূজোর আয়োজন কাল থেকে আমি…

চাঁপার কথা শেষ হবার আগে উৎসাহিত কণ্ঠে মথুরামোহন বললেন—তুমি করবে? বেশ!

পরের দিন সকালে চাঁপা তসরের শাড়ী পরে সাজি হাতে বাগান থেকে পূজার ফুল তুললো—তুলে মন্দিরে এসে মন্দির পরিমার্জ্জনা—শচী আছে সঙ্গে। দুজনে মিলে হুকুম দিয়ে মাহিনা-করা বামুনকে দিয়ে পূজার থালা টাট প্রভৃতি ঝকঝকে করে মাজালো—মন্দির পরিপাটী পরিচ্ছন্ন করলে। তারপর চাঁপাকে মন্দিরের কাজে রেখে শচী ফিরলো বাড়ীতে।

চাঁপা বসে একাগ্র মনে ঠাকুরের পুষ্পপাত্র সাজালো। তারপর পরিষ্কার করে নৈবেদ্য সাজালো। এদিককার আয়োজন নিখুঁত পরিপাটী করে সেরে চাঁপা বসলো বিগ্রহের জন্য মালা গাঁথতে। গাঁথতে গাঁথতে আবেগে চাঁপার কণ্ঠে জাগলো মৃদু-গুঞ্জনে বহুদিনের জানা গান,—

মেরে গিরিধর গোপাল দুঁশরো ন কোই
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম কণ্ঠমাল হোই ॥

নিত্য সকালে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে পট্টবস্ত্র পরে মথুরামোহন মৃদু পদচারণে এসে মন্দিরে বসেন। আজ মন্দিরের কাছে আসতে তিনি শুনলেন চাঁপার কণ্ঠে মধুর কূজনে মীরার এই ভজন! স্নিগ্ধ শান্ত প্রভাত···মথুরামোহন বিমুগ্ধ হলেন। মন্দিরের বাঁধানো বারান্দায় উঠে দেখেন, চাঁপা ভজন গাইতে গাইতে ঠাকুরের মালা গাঁথছে। অপূর্ব্ব!

তারপর পুরোহিত এলো···বামুন দুজন এলো, বাচস্পতি এলেন··· শচী এলো। যথারীতি প্রভাতী পূজা। চাঁপার গাঁথা সেই মালা বিগ্রহের কণ্ঠে···পূজার সময় চাঁপা বিগ্রহের পাশে দাঁড়িয়ে চামর দুলোচ্ছে— দোলাবার কি মনোরম ভঙ্গী! মথুরামোহন বার-বার দেখছেন।

পূজার পর বাচস্পতির পানে চেয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মথুরামোহন বললেন—আমার শ্যামসুন্দর যেন হাসছেন! কতকাল পরে ওঁর মুখে আবার সেই গভীর পরিতৃপ্তি।

চাঁপা নির্বাক। বাচস্পতি বলে উঠলেন—হুঁ। আমার মনে হলো, স্বয়ং লক্ষ্মী যেন ওঁর সেবার ভার নিয়েছেন!

মথুরামোহন বললেন—হুঁ···তারপর শচীর পানে চেয়ে—তোর মার কথা আজ আমার মনে পড়চে, শচী। তাঁর সেবায় আমার শ্যামসুন্দরের মুখে চিরদিন আমি এমনি হাসি দেখেছি! তিনি তাকালেন চাঁপার

দিকে···বললেন—আজ আমায় বড় আনন্দ দিয়েছিস্ মা···আমার শ্যামসুন্দর তোকেও এমনি আনন্দে···

আবেগের উচ্ছ্বাসে মথুরামোহনের কণ্ঠ নিরুদ্ধ হলো···তাঁর দু-চোখ বাষ্পভারে সজল।

সেদিন মধ্যাহ্নে আহারাদির পর···

দোতলায় টানা বারান্দায় বিছানা পাতা। সেই বিছানায় তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে বসে মথুরামোহন···সামনে বাচস্পতি বসে হরিবংশ পড়ে শোনাচ্ছেন। শচী আর চাঁপা কাছে বসে। বটা তার রুটিন-মাফিক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডিউটিতে। পাঠ শুনতে শুনতে একটা উদ্গার তুলে মথুরামোহন বুকে হাত চেপে তাকিয়ায় হেলে পড়লেন! দেখে বাচস্পতি বললেন—কি হলো? কোথায় অস্বাচ্ছন্দ্য?

মুখখানা বিকৃত করে মথুরামোহন লন—বুকে হাত দিয়ে—সেই বেদনাটা···উঃ রা-রা।

বাচস্পতি বললেন—সেই ছুঁচ ফোঁটার মতো?

মাথা নেড়ে বেদনাহত কণ্ঠে মথুরামোহন বললেন—উঁহু।

বাচস্পতি বললেন—তাহলে? অম্ল?

—না।

—বায়ু?

মথুরামোহনের মাথা তাকিয়ার উপর আরো হেলে পড়লো। তিনি বললেন—না, না···

কণ্ঠে উদ্বেগ ভরে বাচস্পতি প্রশ্ন করলেন—তাহলে?

নিশ্বাস ফেলে অসহায় নিরুপায় ভঙ্গীতে মথুরামোহন বললেন—কছু বুঝতে পারছি না! কেমন যেন···কেমন-ধারা কি যেন···

বাচস্পতির চোখে রীতিমত দুশ্চিন্তার ভাব। বাচস্পতি বললেন—তাইতো! তাহলে···বলেই বাচস্পতির আহ্বান—বটা···সেই বড়ি আর একটা।

বাধা দিয়ে মথুরামোহন বলে উঠলেন—না, না, না! উহুঁ! কবিরাজের নিষেধ···তিন ঘণ্টার আগে ও-বড়ি আর এতটুকু নয়!

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শচী বললে—তাহলে উপায়?

বাচস্পতি বড় একটিপ নস্য গুঁজলেন নাকে···নস্যে তাঁর মেধা হয় সাফ, বুদ্ধি খোলে! বাচস্পতি বললেন—ভালো কথা মনে পড়েছে। আমার নতুন-দিদি, মানে, চাঁপাদিদি···এইটুকু বলে বাচস্পতি তাকালেন চাঁপার দিকে, বললেন—তোমার কাছে শুনেছি, সেই কনখলের ধ্যানী বাবার লছমনঝোলার সেই কি না কি বদরী···

দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে চাঁপা বললে—তার মুখে ফুটি-ফুটি করে কথা যেন ফুটতে চায় না···কোনোমতে বললে—হ্যাঁ, বৃহৎ বদরী-চূর্ণ।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বাচস্পতি বললেন—হ্যাঁ। ঠিক, ঠিক, এমনি লক্ষণেই তো সেই চূর্ণ?

বুকে হাত চেপে অসহায় দৃষ্টিতে মথুরামোহন তাকালেন বাচস্পতির দিকে। বাচস্পতি সে-দৃষ্টি লক্ষ্য করলেন; করে তিনি বললেন—মানে, কাল আপনার অসুখের কথা বলছিলুন আমাদের নতুন-দিদিকে। বলছিলুম, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না! সব শুনে নতুনদিদি বললেন—ফিনা, ধ্যানী-বাবা এ-সবের খুব ভালো ওষুধ জানেন।

মথুরামোহনের অসহায় ভাব আরো বাড়লো। নিশ্বাস ফেলে হতাশ কণ্ঠে তিনি বললেন—কিন্তু সে ধ্যানী-বাবাকে এখানে কি করে···

নাকে একটিপ নস্য গুঁজে বাচস্পতি বললেন—বুঝেছি। তাঁকে এখানে আনা যাবে না। তবে তাঁকে না পেলেও সে-ওষুধ আমাদের নতুন

দিদির কাছে···বলে তিনি উত্তরের প্রত্যাশায় চাঁপার পানে তাকালেন।

তেমনি দ্বিধা-জড়িত কণ্ঠে চাঁপা বললে—ওষুধ আমার কাছে আছে!

অকূলে যেন কূল পেয়েছেন, এমনি ভাবে বাচস্পতি বললেন—আছে! ও···তাহলে সেই বৃহৎ বদরী-চূর্ণ কর্ত্তাকে এখনি···ব'লেই কর্ত্তার দিকে চেয়ে—আপনি কি বলেন?

মথুরামোহনের মনে দ্বিধা··। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত। তিনি বললেন—কিন্তু তাতে ম্লেচ্ছ কোনোরকম···

প্রদীপ্ত কণ্ঠে বাচস্পতি বললেন—ম্লেচ্ছাচার? আপনি পাগল হয়েছেন! লছমনঝোলার বদরী···কনখলের ধ্যানী-বাবা···তার মধ্যে ম্লেচ্ছাচার!

মথুরামোহন অপ্রতিভ হলেন, চাঁপার দিকে চেয়ে বললেন—হুঁ। তাহলে মা, তুমি আমাকে···

চাঁপার পা চলে না! ওঁর এই অস্বাচ্ছন্দ্য···তা নিয়ে কৌতুক! চাঁপাকে একরকম ঠেলে নিয়ে শচী ঘর থেকে বেরিয়ে চললো···বললে—চ ভাই, শীগ্‌গির···

চাঁপার ঘরে চাঁপা আর শচী। মাটীর জারে ছিল কাঁচের বোতল থেকে উজাড়-করে ঢালা বাই-কার্ব্বনেট-অফ-সোডা। মাটীর জারের গায়ে কাগজ আঁটা···সেই কাগজে লেখা বৃহৎ বদরী-চূর্ণ। বাচস্পতির কূট-নীতি! সেই সোডা শ্বেত-পাথরের বাটিতে খানিকটা ঢেলে শচীর চাপে চাঁপাকে আসতে হলো মথুরামোহনের কাছে। এসে পাথরের বাটিতে জল ঢালা···সোঁ সোঁ শব্দে বিস্ফোরণ দেখে বাচস্পতি বললেন—ইস্, কি তেজ! হবে না? মুনি-ঋষির ওষুধ! নিন, খেয়ে ফেলুন।

মথুরামোহন খেলেন এবং খেয়ে বললেন—আঃ। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো উদ্গার…আরাম পেলেন।

এমনি করে এখানে দিনগুলো সকলের পক্ষে ক্রমে সহজ হয়ে এলো। পূজার কাজে চাঁপার আন্তরিক নিষ্ঠা…মন্দিরের সব ভার তার হাতে। এমন চমৎকার লাগছে মথুরামোহনের! নিজের শরীরে এটা-ওটা নানা উপসর্গ…বাচস্পতির কূট-নীতিতে চাঁপার হাতে নানা ঔষধ… চাঁপার উপর মথুরামোহনের মন দিনে দিনে স্নেহে মায়ায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে! বাচস্পতির সঙ্গে শচীর নিত্য সেই এক পরামর্শ—বাবাকে বলে চাঁপার সঙ্গে বাসুর যাতে…কথাটা তুমি পাড়ো, বাচস্পতিদা। বাচস্পতি বলেন—ক্ষেপেচো দিদি। তাড়াতাড়ির কাজ নয়! জানো, শাস্ত্রে বলেছে, শনৈঃ পন্থা, শনৈঃ কন্থা, শনৈঃ পর্ব্বত-লঙ্ঘনম্! কর্ত্তার সনাতনী মত…পর্বতের মতো বিরাট উঁচু…সে পর্ব্বত চট্ করে লঙ্ঘন করতে গেলে বিপদ আছে দিদি!

শুনেও শচী চুপ করে থাকতে পারে না, বলে—আমি এখানে আর কদিন, বলো? উনি শিলং থেকে ফিরলেই তারপর…

শেষে বাচস্পতি বলেন—দৈব! দৈবকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

১৬

দক্ষিণেশ্বরে বাসু যা হয়ে আছে, বলবার নয়। আজ দশ-বারো দিন বাচস্পতির সঙ্গে শচী গেছে রাধানগরে—সেই সঙ্গে জয়গোপালবাবুরাও… এর মধ্যে দিদি খালি একখানি চিঠি লিখেছে বাসুকে। লিখেছে,

বাবাকে সব কথা বোঝাতেই বাবার রাগ একেবারে জল! এবং এটর্ণি-বাবুকে বাবা সেই বারোশো টাকা পাঠিয়ে দেছেন—নায়েবকে দিয়ে এ টাকা খয়রাতী-খাতে বাবা নিজে থেকে লিখিয়েছেন। আরো লিখেছে, চাঁপা তাদের বাড়ীতেই আছে শচীর সঙ্গে—মন্দিরে দুবেলার পূজার ও আরতির আয়োজন করে। ঠাকুরের উপর চাঁপার ভক্তি দেখে বাবা খুব খুশী। ব্যস্! শুধু এই! বাসুর অভিমান হয়, রাগ হয়...এখানে ঐ চাঁপাকে লক্ষ্য করে কিরণদার কী তামাসা! দিদি বললে, বাবাকে বলে চাঁপার সঙ্গে বাসুর...সে-সবের এতটুকু খবর নেই দিদির চিঠিতে !...কি দরকার ছিল এখনি বিয়ের কথা বলবার? সে কারো গলা ধরে সাধেনি যে, ওগো, চাঁপার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দাও... বিয়ের কথা বাসুর মনেও হয়নি! চাঁপাদের বাড়ী যাওয়া...ওঁদের সকলের সঙ্গে কথা কওয়া...বাসুর খুব ভালো লাগছিল! আর চাঁপা...হুঁ, তাকে বাসুর ভালো লাগে। তাদের এমন সাত-তাড়াতাড়ি রাধানগরে নিয়ে যাবার কি দরকার ছিল? বাসু এখানে কি রকম একা-একা... কথা কইবে, দুটো গল্প করবে, এমন লোক কেউ নেই! ওঁদের কি, হাসি গল্প নিয়ে মজায় সব আছেন ওখানে! আর বাসু?

এ-সব কথা ভাবতে ভাবতে বাসুর বুকের ভিতরটা যেন চোখের জলে ভিজে ওঠে! কিছু ভালো লাগে না! খুব ভোরে উঠে সে বেড়াতে চলে যায়...যায় ঐ চাঁপাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে ও দিকটাতে... রোজ! ওই পথেই আবার ফেরে। চাঁপাদের বাড়ীর সামনে গিয়ে দেখে, দরজায় এত-বড় তালা আঁটা।...দেখে বাসুর বুকখানা কি রকম করে ওঠে, বাসুই জানে! তারপর নিয়ম-রক্ষা করে নাওয়া-খাওয়া, আর কলেজ। কলেজে আগে বসতো প্রথম সারের বেঞ্চে—নিবিষ্টমনে লেক্‌চার শুনতো। এখন বসে একেবারে সব শেষের সারে—প্রোফেসররা

তেমনি লেক্‌চার দিয়ে যান—বাসু প্রোফেশরদের পানে একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—প্রোফেশরদের কথাগুলো কানে এসে লাগে—মনে পৌছুতে পারে না! মন সারাক্ষণ ভাবে চাঁপার কথা! মনে হয়, চাঁপা সেখানে কি করছে? শ্যামসুন্দরের পূজার কাজ? আর কি? এক একবার আকুল হয়ে সে ভাবে, লিখবে নাকি চাঁপাকে দু'-লাইন চিঠি? বেশী নয়, দুটি কথা। লিখবে—চাঁপা, তোমাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছা করছে! সঙ্গে সঙ্গে শিউরে ওঠে! বাপ্‌ রে, তাহলে···

কলেজ থেকে যথাসময়ে বাড়ী ফেরে। বাড়ী ফিরে মুখ-হাত ধুয়ে জলখাবার খেতে হয়—পাছে মধু কিছু ভাবে! তারপর সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। বেরিয়ে চাঁপাদের বাড়ীর দিকে যায় না—ভয় হয়, যদি কেউ কিছু মনে করে! সে যায় মন্দিরের দিকে···কোনোদিন বালির নতুন পুলের উপর গিয়ে দাঁড়ায়···অসীম শূন্যে কল্পনার পাখায় ভর করে তার মন উড়ে চলে রাধানগরের বাড়ীতে! সূর্য্য অস্ত যায়··· আকাশের পানে চেয়ে বাসু ভাবে···মন্দিরে প্রদীপ জ্বালা হয়েছে··· চাঁপা মন্দিরে বসে পূজার পাত্র সাজাচ্ছে! তারপর আরতি···চাঁপা ধূপ জ্বালছে, শাঁখ বাজাচ্ছে···বাসুর মানসনেত্রে সেখানকার এ ছবি সুস্পষ্ট রেখায় ভেসে ওঠে!···কতক্ষণ সে এমনি দাঁড়িয়ে থাকে··· মনে শুধু চাঁপার কথা। তারপর হঠাৎ খেয়াল হয়, অনেকখানি রাত হয়েছে—ধীর-পায়ে বাসু ফেরে বাড়ীর পথে। বাড়ীতে ঢুকতে পারে না। কে যেন তাকে ঠেলে চাঁপাদের বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত নিয়ে যায়! দরজার সামনে বাসু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে বিশ্ব-পৃথিবী ভুলে। সেদিন ভোলা-মনে কখন এগিয়ে গিয়ে ওদের দরজার তালাটা ধরেছিল—কোনো খেয়াল নেই! হঠাৎ জয়গোপালের বাড়ীর দুখানা বাড়ীর পরে যে মুদির দোকান—সেই দোকানের মুদি এসে বলে উঠলো,

কাকে খুঁজছেন? বাসু চমকে উঠলো! খেয়াল হলো! আমতা আমতা করে সে বললে—জ-জ-জ-য়-গোপালবাবু। মুদি বললে, তাঁরা কেউ এখানে নেই—বাইরে গেছেন। এ-কথায় মুদির পানে চেয়ে বাসু বললে—অ! তারপর এমন লজ্জা হলো···কোনোমতে বাড়ীর দিকে নয়—উল্টো দিকে সোজা কতদূর যে চলে গেল···

আর একদিন···কলেজ থেকে ফিরছে, শ্যামবাজারের মোড়ে বাস ধরবে, দক্ষিণেশ্বরের বাস···ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে, বাস নেই···পিছনের একটা দোকানে গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজলো···

আমি ভুলিতে পারিনে তোমারে—
এ-মনে বিরাজো অহরহ!
কখন্ কি মায়া-ডোরে বাঁধিলে আমারে—
দয়া করে' কহ গো, মোরে কহ।
তোমারে ঘিরিয়া মোর যত সাধ আশা···
একেই কি লোকে বলে ভালোবাসা?···

শুনতে শুনতে বাসুর সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ! মনে হলো, তাব কি তবে তাই হয়েছে? ভালোবাসা? মনে পড়লো, কলেজে Select Poems বই-এ কবিতায় পড়েছে—

My heart is full of thee—
And this is love—you see!

তার মনেও ঠিক অমনি···

তখন থেকে মনের মধ্যে আর এক রকমের তরঙ্গ! প্রেম··· প্রেম···Love! একথা ভেবে মন কী আনন্দে ভরে ওঠে! কল্পনায়

কত ছবি জাগে! পরক্ষণে বাসু নৈরাশ্যে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে

সেদিন কলেজের পর উদাস মনে বাড়ী ফিরছে। কলেজ থেকে বেরিয়ে নিত্য সে ট্রামে চড়ে···ট্রামে করে এসে নামে শ্যামবাজারের চৌমাথায়। আজ আর ট্রামে ওঠে নি। কলেজ থেকে বেরিয়ে হেঁটেই আসছে শ্যামবাজারের দিকে···অলস মন্থর গতি—পা চলতে চায় না! চলে কি হবে? পথের শেষে সেই তো বিরাট শূন্যতা! যতক্ষণ তবু বাহিরে লোকের ভিড়ে থাকা যায়! হঠাৎ চোখে পড়লো, ফুটপাথে বসে এক জ্যোতিষী···সামনে কতকগুলো পাঁজি-পুঁথি আরো কি কি সব। মনে একটা দোলা! বাসু এসে বসলো জ্যোতিষীর কাছে, বললে—আমার হাতটা একবার···বলেই জ্যোতিষীর সামনে নিজের ডান হাতখানা মেলে ধরলো।

চকিত দৃষ্টিতে বাসুকে দেখে নিলে জ্যোতিষী। ছোকরা বয়স—হাতে বই-খাতা···কেমন উদাসপানা চেহারা। চতুর ব্যক্তি! পেশার অভিজ্ঞতায় বাসুর হাতখানা ধরে দু-মিনিট দেখেই জ্যোতিষী বললে—হুঁ, খারাপ সময় যাচ্ছে। মনে···

এইটুকু শুনেই বাসু বিকল! একেবারে সে বলে উঠলো—হ্যাঁ। মন ভয়ানক খারাপ। কিছু ভালো লাগছে না···কিছুতে সোয়াস্তি পাচ্ছি না।

বাসুর হাতের রেখাগুলোর উপর আঙুল বুলোতে বুলোতে তার দিকে না চেয়েই জ্যোতিষী বললে—সে-কথা মুখে বলতে হবে না। হাতের এই রেখাগুলো দেখে আমি তা বুঝছি। টাকা-কড়ি···পরীক্ষা···অসুখ-বিসুখ···মেয়েছেলে···

কথাগুলো বলবার সময় জ্যোতিষীর তীক্ষ্ণদৃষ্টি বাসুর মুখে দৃঢ়-নিবদ্ধ··· জ্যোতিষীর মুখে 'মেয়েছেলে' কথাটুকু নিঃসৃত হবামাত্র বাসু নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারলো না। সে বললে—আজ্ঞে, তাই···তার জন্য আমার···

জ্যোতিষী ওস্তাদ মানুষ! বাধা দিয়ে সে বললে—ও আর মুখে বলতে হবে না! হাতের এই রেখা থেকে বুঝতে পারছি। মেয়েছেলে···বাড়ীর কাছাকাছি···তাকে দেখে অনুরাগ! তার জন্য মনটা···কেমন তো?

বাসুর গায়ে রোমাঞ্চ-রেখা···কপালে ঘাম···বাসু বললে—আজ্ঞে! বাসুর স্বর কম্পিত···স্খলিত।

বাসুর হাতখানা ধরে ঘুরিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে একটা নিশ্বাস ফেলে জ্যোতিষী বললে—হুঁ। দিনগুলো নিরানন্দে কাটছে! কিন্তু···এই যে রেখা···ইস্, সামনে ফাঁড়া···আঘাত পাবেন।

বাসু চমকে উঠলো! বললে—তাকে পাবো না তাহলে?

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে ঈষৎ উদ্বেগভরা কণ্ঠে জ্যোতিষী বললে—হুঁ···পেতে পারেন···আবার নাও পেতে পারেন!

বাসুর বুকখানা ধ্বক্ করে উঠলো···দুচোখে জল যেন ঠেলে বেরুবে! শুষ্ক উদাস কণ্ঠে বাসু বললে—তার মানে?

আর একটা নিশ্বাস ফেলে জ্যোতিষী বললে—মুস্কিল!···এই যে রেখা···দেখছেন···এটি বক্র!

রুদ্ধকণ্ঠে বাসু বললে—বক্র! হ্যাঁ!···তা এ বক্ররেখাকে সোজা সিধে করে দিতে হবে আপনাকে! মানে, তাগা, কবচ, মাদুলি, মন্ত্র···

জ্যোতিষী খুশী হলো···তার টোপ ধরেছে! জ্যোতিষী বললে—হেঁ হেঁ বক্ররেখা সিধা করা অসম্ভব নয়! আমাদের মন্ত্র-তন্ত্র···এ-সব কি

মিথ্যা ? এমন প্রক্রিয়া আছে, বুঝলেন, যার জোরে এই বক্ররেখাকে টেনে-পিটে একেবারে সোজা সিধে চোস্ত করে দেওয়া চলে। তবে···

বাসু বললে মিনতিভরা কণ্ঠে—দয়া করে তাহলে সেই প্রক্রিয়া···যত খরচ লাগে···

—হুঁ! বলে জ্যোতিষী পাশ থেকে ছোট থলি নিয়ে সেই থলি খুলে কতকগুলো মাদুলি বার করলে; বার করে সবচেয়ে বড় মাদুলিটা নিয়ে বললে—অ্যাই! আপনার ক্ষেত্রে এইটি! মানে, এটি হলো নায়িকা-কবচ! মন্ত্রঃপূত···একেবারে গ্যারান্টি-দেওয়া।···এ কবচ ধারণ করলেই ব্যস্! আপনার ঐ নায়িকার আর আপনার মধ্যে যে সাগর-প্রমাণ দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান···তাতে সেতু-বন্ধ!···তাহলেই···

বাসুর বুক কালো মেঘে ঢেকে গিয়েছিল, জ্যোতিষীর এ-কথায় সে মেঘ কেটে অমল-ধবল জ্যোৎস্নারাশি! উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বাসু বললে—এটি আমি নেবো। এর জন্য···

বাসুর মুখের কথা লুফে নিয়ে জ্যোতিষী বললে—সামান্যই···পাঁচ টাকা মাত্র। তবে মনস্কামনা পূর্ণ হলে এসে আমাকে পাঁচটি পয়সা দিয়ে যাবেন···মা মহা-নায়িকার পূজার জন্য।

পকেট থেকে সূতায়-বোনা পার্শ বার করে একখানা পাঁচ টাকার নোট নিয়ে বাসু দিলে জ্যোতিষীর হাতে।

নোটখানাকে মাথায় ঠেকিয়ে জ্যোতিষী সেটা পকেটে পুরলো। তারপর মাদুলি দিলে বাসুর হাতে। দিয়ে বললে—কাল শনিবার··· প্রশস্ত দিন···সূর্য্যোদয়ে···শুদ্ধাচারে, পূর্ব্বমুখী দাঁড়িয়ে বাঁ-হাতে ধারণ করবেন। আর প্রত্যহ সকালে উঠে পূবদিকে চেয়ে আপনার নায়িকার নামটি একশো-আটবার জপ করতে হবে। ভক্তি-ভরে··· শুদ্ধাচারে···তাঁর মূর্ত্তি ধ্যান করে···

বাসু নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো ! আরামের নিশ্বাস ! এবং…

পরের দিন সকালবেলা…নিত্যকার মতো বেড়াতে যাওয়া হলো না। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে গরদের ধুতি পরে বাসু দাঁড়ালো ঘরের জানলার ধারে…পূর্ব্বমুখী…আকাশের দিকে চোখ তুলে। দুচোখ বুজে চাঁপার মুখখানি মনে করে বুকে হাত রেখে নাম-জপ—চাঁপা… চাঁপা… চাঁপা…চাঁপা…চাঁপা…

ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়েছিল, পাছে মধু এসে পড়ে! বাসু নাম জপ করছে, দরজার ওদিক থেকে মধুর কণ্ঠ—দাদাবাবু… দাদাবাবু…

বলতে বলতে দরজা ঠেলে মধু ঘরে ঢুকলো। ঢুকেই বললে—চিঠি…

জপে বাধা! বাসু বিরক্ত হলো। মধুর পানে চেয়ে খেঁকিয়ে উঠলো—জ্বালাতন! জপ করতে দিবিনে ?

মধু বললে—তুমি তো সকালে বেড়িয়ে এসে তারপর সন্ধ্যাহ্নিক করো! আজ বেড়াতে যাবার আগেই…কে তা জানে!

বিরক্তভাবে বাসু বললে—রোজ বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যাহ্নিক করি বলে আজও তাই করতে হবে…তার মানে ?…কি চাই ?

মধুর হাতে ডাকে-আসা লেফাফা। সেটা বাসুর দিকে ধরে বাসু বললে—এই চিঠিখানা…কাল বিকেলে এসেছে…সদা মালী কোথায় রেখেছিল…কাল দেয় নি, আজ এখন আমাকে দিলে।

লেফাফায় শচীর হাতে লেখা নাম-ঠিকানা। দেখে বাসুর মনের ঝাঁজ তখনি গেল মিলিয়ে! চিঠিখানা নিয়ে খাম ছিঁড়তে ছিঁড়তে বাসু বললে—আরে, দিদির চিঠি!

তখনি চিঠি পড়া। দিদি লিখেছে—

—এ পর্য্যন্ত আমাদের প্ল্যান ঠিক চলেছে। চাঁপাকে বাবার খুব ভালো লেগেছে। তার সেবা-যত্নে বাবার রোগের উপসর্গগুলো প্রায় নেই বললেই হয়! আর তার পূজোর কাজ দেখে বাবা খুব খুশী। বটার বদলে চাঁপা এখন বাবাকে ওষুধপত্র··· .

তারপর চোখ বুলিয়ে চিঠিখানা শেষ করলে বাসু। বিরক্ত হলো। ভ্রূকুঞ্চিত করে চিঠিখানা লেফাফাশুদ্ধ পাকিয়ে ধ্যেৎ · বলে ফেললো সে মেঝেয় ছুড়ে! সেই সঙ্গে ' জ্বালো কণ্ঠে বলে উঠলো—বাজে কথা যত! খালি সেবা আর যত্ন···যত্ন আর সেবা! আসল কথা···হুঁঃ!

রাধানগরে মথুরামোহনের বাগান। বাগানে পাথরের বেদীতে বসে মথুরামোহন···সামনে কখানা পুরাণ-গ্রন্থ···বাচস্পতিকে মথুরামোহন বললেন —আশ্চর্য্য ঔষধ। আমার চাঁপা-মার ঐ বৃহৎ-চূর্ণ খেয়ে বুঝলে, বাচস্পতি···

কর্ত্তার ভুলটুকু শুধরে বাচস্পতি বললেন—আজ্ঞে, বৃহৎ-চূর্ণ নয়···বৃহৎ বদরী-চূর্ণ!

অপ্রতিভ কণ্ঠে মথুরামোহন বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বৃহৎ বদরী-চূর্ণ। ওটা খেয়ে কদিন বেশ ভালো বোধ করছি, বাচস্পতি। চমৎকার খিদে হচ্ছে আর অম্বলের ব্যথা-ট্যাথা? মোটে অনুভব করছি না! হবে না? সাধু-সন্ন্যাসীর ওষুধ! এ কি তোমাদের ম্লেচ্ছ দাওয়াই!

বাচস্পতি বললেন—কিন্তু আজ মনে হলো, চলবার সময় যেন আপনি পা কেমন টেনে টেনে···

ললাট কুঞ্চিত···মথুরামোহন বললেন—একটু খুঁড়িয়ে···হ্যাঁ, বোধ হয়, সামনে একাদশী, তাই সেই বাতের ব্যথাটা যেন···

বাচস্পতি বললেন—ও···বটে! তাই দেখলুম, চাঁপা-দিদি কি-না-কি বশল্যকরণীর সরবৎ···

মথুরামোহন বললেন—হ্যাঁ। শচীও আমাকে খুঁড়োতে দেখেছে! তাই শচী চাঁপা-মাকে বললে—বাতের কি ওষুধ ধ্যানীবাবা চাঁপা-মাকে··· তাতে চাঁপা-মা বললেন—হ্যাঁ, তাঁর কাছে সে ওষুধও আছে। আমি আনতে বললুম। শচী আর চাঁপা-মা সে-ওষুধ আনতে গেছেন!

বাচস্পতির সঙ্গে এখানে মথুরামোহনের এই কথা—অন্দরের রান্না-ঘরে শচী তখন বার্লির টিন এনে তা থেকে খানিকটা দেছে জলে গুলে জ্বাল দিয়ে বার্লি বানাতে। রান্নাঘরে উনুনে কড়া চাপিয়ে চাঁপা বার্লি তৈরী করছে আর শচী বার্লির টিন থেকে বার্লির গুঁড়ো একটা কড়ির জার-এ রেখে জারটা দোতলায় চাঁপার ঘরে আলমারিতে তুলে রাখতে গেছে। বার্লির টিনটাও সেই সঙ্গে নিয়ে গেছে—পরে এক-সময় সেটাকে নিঃশব্দে কোথাও পাচার করবে লোকচক্ষুর অন্তরালে! তবে টিনের উপর কাগজের যে-মোড়ক···কিন্তু সে-কথা ক্রমশঃ-প্রকাশ্য।

দোতলার ঘরে বার্লির জার রেখে শচী এলো রান্নাঘরে, বললে—হলো?

চাঁপা বললে—হ্যাঁ। বলে কড়া থেকে জ্বাল-দেওয়া বার্লিটুকু পাথরের বড় খোরায় ঢাললো।

শচী বললে—জুড়ুলে নিয়ে যেয়ো। আমি এগুই। হ্যাঁ, বার্লির জার-এ বাচস্পতিদার দেওয়া সেই লেবেল এঁটে দিয়েছি। মনে থাকে যেন···বার্লির এই গুঁড়োর নাম বিশল্যকরণী।

মলিন মৃদু-হাস্যে চাঁপা বললে—তোমাদের কথায় কত পাপ যে করছি!

হেসে শচী বললে—যে-ছলনায় মঙ্গল হয়, কোনো অনিষ্ট হয় না, তাতে পাপ নেই, চাঁপা।

বাগানে মথুরামোহনের মুখে চাঁপার গুণকীর্ত্তন শেষ হতে চায় না! তিনি বললেন—মেয়েটি বড় ভালো, বাচস্পতি···যাকে আমরা বলি, লক্ষ্মী! এবং বেশ বুদ্ধিমতী! পুরাণ-টুরাণ যা পড়েন···সে-সবের অর্থ বেশ উপলব্ধি করেই পড়েন! আর ওঁর সেবা-যত্ন···

এক-টিপ নস্য নাকে গুঁজে বাচস্পতি বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, হবেই তো ···সনাতনী!

মথুরামোহন বললেন—হুঁ! বৃদ্ধ বয়সে মায়ের এই সেবাটুকু···না পেলে সারা পৃথিবীর উপর মনটা ঝেঁজে ওঠে, বুঝলে বাচস্পতি···আর পেলে অত্যন্ত কৃপণ-মানুষও দলিল লিখে তার যথা সর্ব্বস্ব দান করে দিতে পারে। কথাটা বলে মথুরামোহন হাসলেন।

বাচস্পতি বললেন—শুধু তাই? নতুনদিদিকে দেখে এই প্রথম আমার মনে হলো, সনাতন-ঘরের মেয়ে যদি লেখাপড়া শেখেন, তাহলে সকল দিকে মঙ্গল! একালে অনেক বাড়ীর মেয়েরা শুনি একটু ইংরেজী শিখলেই তাঁদের নাক একেবারে যায় বেঁকে! সাজগোজ ছাড়া আর কিছুতে নজর থাকে না! শুধু বিলাস···মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন এঁদের কারো পানে তাকান না। ওঁদের ফেলে কুকুরের সেবাতেই মগ্ন থাকেন! শুনেছি ঠাকুর-দেবতারা মোটে পাত্তা পান না তাঁদের কাছে! স্বামী যে পাত্তাটুকু পান, তা শুধু টাকা-পয়সার খাতিরে!

কথাটা কর্ত্তার ভারী মনে লাগলো। হাসতে হাসতে তিনি বললেন—ঠিক বলেছো বাচস্পতি! এই জন্যই সহরের নামে আমার আতঙ্ক!

তারপর আবার নিষ্ঠা সম্বন্ধে কথা। বাচস্পতি বললেন—চাঁপাদিদি প্রথম যখন আপনার কাছে এলেন, তাঁর পায়ে নাগরা জুতো দেখে আপনি বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয়, নাগরার চাপে

আমাদের ধর্ম্মের কিছু ক্ষতি হয় না। তার কারণ, নাগরা সনাতন আমলের। ঐ যে উঁচু-গোঁড়ালি জুতো দেখি মেয়েদের প য়ে, ওকেই শুধু ভয়! তাছাড়া সতীকুলরাণী পদ্মিনী দেবী নাকি নাগরা জুতো পায়ে দিতেন। তবে হ্যাঁ, বাংলা দেশ এবং দেশাচার!

মথুরামোহনের ললাট কুঞ্চিত···তিনি বললেন—দেশাচার! অষ্টমে গৌরী···না হলে চাঁপা-মাকে পুত্রবধূ···কুমারী···কিন্তু কিশোরী!

বাচস্পতি বললেন—তাতে শাস্ত্রে বাধে না! শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলছে—

ভাগ্যহীনে গৃহে যত্র শ্বশ্রূমাতা ন রাজতে
তদ্গৃহে শোভতে লক্ষ্মী চার্বঙ্গী কিশোরী বধূ।

অর্থাৎ যে-গৃহে শাশুড়ী নেই, সে গৃহে চার্বঙ্গী কিনা, সুন্দরী···কিশোরী বধূ লক্ষ্মী-শ্রীতে শোভা পান! তাছাড়া শাস্ত্রে নজীর আছে—দ্রৌপদী, দময়ন্তী, স্বয়ং সাবিত্রী দেবীও ছিলেন কিশোরী কুমারী ··পার্বতী দেবীও··· ডাগর বয়সেই এঁদের বিবাহ হয়। বাল্য-বিবাহ···মুসলমান আমল থেকে। এইটেই ম্লেচ্ছ প্রথা!

মথুরামোহনের ছ'চোখ বিস্ফারিত! তিনি বললেন—বটে! তারপর একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠে উৎসারিত হলো অস্ফুট বাণী—সমস্যা!

ঠিক এমনি সময়ে চাঁপা এসে দাঁড়ালো···তার হাতে শ্বেত-পাথরের গেলাসে বার্লির সরবৎ। শচী আগেই এঁদের শাস্ত্র-নজীর-আলোচনার মধ্যে এসে মথুরামোহনের পাশে বসেছে—চাঁপাকে দেখে সে বলে উঠলো—ও, এনেছো···বিশল্য-করণী?

মথুরামোহন চেয়ে দেখলেন, চাঁপার দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন—দাও মা।

সরবতটুকু পানে নিঃশেষ করে বললেন—আঃ! স্নিগ্ধ! বাঃ! এবং বেশ সুস্বাদু।

বাচস্পতি বললেন—এতে নিশ্চয় আরাম পাবেন।

হঠাৎ বটার আবির্ভাব…তার হাতে বার্লির টিনে ইংরেজী-অক্ষরে ছাপা নীল রঙের যে লেবেল আঁটা থাকে, সেই লেবেল। সেখানা মথুরা-মোহনের সামনে ধরে বটা বললে—এটা দেখুন তো—কোনো দলিলের ইষ্টাম্পো নয় তো?

লেবেলটা মথুরামোহন হাতে নিলেন…তাতে ছাপা ইংরেজী অক্ষরগুলায় একাগ্র দৃষ্টি নিবেশ! বাচস্পতি হতভম্ব! শচীর দুচোখ আতঙ্কে এত-বড়! আর চাঁপা একেবারে কাঁটা! লেবেলখানা পড়ে মথুরামোহন শিউরে উঠলেন, বললেন—দলিলের ষ্ট্যাম্প নয় তো! এতে লেখা হাচিনসন্স্ পেটেণ্ট বার্লি…মেড ইন ইংলাণ্ড।…তিনি তাকালেন বটার দিকে। বললেন—এ কি অনাচার! আমার বাড়ীতে বিলিতি বার্লি!…এ কাগজ কোথায় পেলি?

বটা বললে—আজ্ঞে, ঐ রান্নাবাড়ীর উঠোনে!

মথুরামোহনকে কে যেন পাঁজাকোলা করে উঁচুতে তুলে দড়াম্সে মাটীতে ছুড়ে ফেললো! তাঁর দুচোখ ঠিকরে ছিটকে পড়বে যেন! তিনি বললেন—রান্নাবাড়ীর উঠোনে।

বটা বললে—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

বাচস্পতি আর শচী…দুজনের চোখে-চোখে সাতঙ্ক দৃষ্টি-বিনিময়—চাঁপা ভয়ে যেন ভেঙ্গে পড়বে! মথুরামোহন বললেন—সেখানে এ কাগজ এলো কোথা থেকে?

বটা বললে—তা আমি কি করে জানবো, আজ্ঞে? দেখলুম, পড়ে রয়েছে…ভাবলুম, ইষ্টাম্পোর কাগজ!

মথুরামোহন বললেন—ইষ্টাম্পো নয়!…এমন সময়ে রান্নাবাড়ীতে ছিল কে, শুনি?

বটা বললে—আজ্ঞে, নতুন দিদিমণি উনুনে কি যেন…

চাঁপার মনে হলো, বুক থেকে হৃৎপিণ্ডটা এখনি খশে বেরিয়ে যাবে! তার মাথা আরো নীচু। বাচস্পতি আর শচী নিরবলম্বের মতো শূন্যে ঝুলছেন! মথুরামোহন তাকালেন চাঁপার দিকে, বললেন—তুমি জানো, এ-কাগজ কোথা থেকে…

চাঁপা জবাব দেবে কি, সে যেন অহল্যার মতো পাষাণ হয়ে গেছে! শচী তাকালো বাচস্পতির দিকে…শচীর সে দৃষ্টি বাচস্পতির মাথায় শলাকাজ্ঞানাঞ্জন! বটার দিকে তাকিয়ে বাচস্পতি বলে উঠলেন—তোর নতুন-দিদিমণি তো ছিলেন রান্নাঘরে…আর এ কাগজ তুই পেয়েছিস উঠোনে!

বটা বললে—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

বাচস্পতি বললেন—(মথুরামোহনের উদ্দেশে হলেও কথাটা বললেন বটার দিকে চেয়ে) তাহলে নতুন-দিদি কি করে জানবেন, এ কাগজ কোথা থেকে এসেছে?

শচী আরামের নিশ্বাস ফেললো…চাঁপার মনে হলো, বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটার দোলন যেন কমলো! মথুরামোহনের দৃষ্টি বাচস্পতির পানে…বাচস্পতি বললেন—কাক-চিলের কাণ্ড! কত জায়গা থেকে কত জিনিষ এনে কোথায় না ফেলছে! এই সেদিন…বলে বাচস্পতি তাকালেন মথুরামোহনের দিকে, বললেন—জানেন, এই সেদিন…এ-বাড়ী থেকে বেরুচ্ছি, আর পথে আমার সামনে ঠক্ করে পড়লো পাঁঠার একখানা হাড়!

মথুরামোহন চমকে উঠলেন। বললেন—পাঁঠার হাড়!

বাচস্পতি বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই এত-বড়!...চোখ তুলে চেয়ে দেখি, একটা চিল! কাক-চিলের জ্বালায় অনেক সময় জাত-ধর্ম্ম রক্ষা করা দায় হয়ে ওঠে!

কথাটা মথুরামোহনের মনে লাগলো। তাঁর আতঙ্ক হলো, তাইতো! তাহলে কাক-চিলের হাতে জাত-রক্ষা...তিনি বললেন—হুঁ!

বাচস্পতি নাকে বেশ এক-টিপ নস্য গুঁজলেন...গুঁজে বললেন—এ কাগজ ঐ কাক-চিলে এনে ফেলেছে! বলেই বেশ চিন্তাকুল ভাবে তিনি দিলেন উপদেশ—ওটা ফেলে দিন...নোঙরা জিনিষ! তারপর তাকালেন বটার দিকে, বটাকে বললেন—তুই যা...হাত ধো। কূয়োর জলে নয়...বাড়ীতে গঙ্গাজল আছে—সেই গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে কর্ত্তার জন্য ঘটীতে করে এক-ঘটী গঙ্গাজল নিয়ে আয়। তারপর এই কাগজখানা কুড়িয়ে বাইরে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলবি! অগ্নিশুদ্ধি! হ্যাঁ, আপদঃ শান্তি!...

তারপর আবার মথুরামোহনের দিকে তাকানো...তাকিয়ে বাচস্পতি বললেন—ও-হাত উঁচু করে রাখুন...যতক্ষণ না গঙ্গাজল আসে! ছি-ছি... কি অনাচার!

১৭

বাচস্পতির গৃহে জয়গোপাল বাবুদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা। মা শচীর চুল বেঁধে দিচ্ছেন, চাঁপা বসে আছে পাশে। বাচস্পতি একখানা মোড়ায় বসে তামাক খাচ্ছেন ..জয়গোপাল দাওয়ায় বসে।

শচী বললে—বাবাকে কদিনে এমন করেছে...চাঁপাকে না হলে বাবার একদণ্ড চলে না, মাসিমা! উঠতে বসতে...নাইতে খেতে চাঁপা...

চাঁপা···চাঁপা! সত্যি, আমার হিংসে হয় মাসিমা! আমি মেয়ে··· আমার চেয়েও বাবা চাঁপাকে বেশী ভালোবাসেন।

হেসে বাচস্পতি বললেন—তা তো হবেই দিদি। তুমি পরের ঘরের লক্ষ্মী···আর চাঁপা-দিদি···উনি বসবেন এখানে ওঁর ঘরে লক্ষ্মী হয়ে!

চাঁপা লজ্জায় জড়সড়। বাচস্পতির দিকে চেয়ে মা বললেন—আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক···এমন ভাগ্য চাঁপার হবে!

শচী বললে—হবে মাসিমা। বাচস্পতিদা যে-রকম উঠে পড়ে লেগেছেন···ওঁর মুখে কিছু বাধে না! বানিয়ে এত মিথ্যা কথা বলতে পারেন, আমরা শিউরে উঠি! কত পাপ যে বাচস্পতিদা করছে!

বাচস্পতি বললেন—পাপ কিসের, দিদি?

শচী বললে—নয়? তুমিই বলো, কি মিথ্যা কথাই না বলছেন! বানিয়ে শ্লোক তৈরী করে শাস্ত্রের কথা বলেচালাচ্ছেন···জানেন মাসিমা?

মৃদুহাস্যে মা বললেন—শুনি মা, উনি রোজ এসে আমাদের সব কথা বলেন।

শচী বললে—আবার বাহাদুরি করে বলা হচ্ছে, কি পাপ?

হাসতে হাসতে বাচস্পতি বললেন—কিন্তু আমার এ মিথ্যাবাদ অপ্রিয় সত্য কথার চেয়ে ভালো নয়? তাছাড়া যে-মিথ্যা কথায় লোকের ভালো হয়, এতটুকু অনিষ্ট হয় না, তাকে আমি কোনোদিন পাপ বলে স্বীকার করি না। যে মিথ্যা-কথায় মানুষের অনিষ্ট হয়, অহিত হয়, আমি জানি, সেই মিথ্যাই পাপ!

চাঁপা বললে শচীকে উদ্দেশ করে—এবার ওঠো দিদি। অনেকক্ষণ এসেছি। বাবা হয়তো···

হেসে শচী বললে—দেখছেন মাসিমা, দরদ! তবু এখনো বিয়ে হয়নি! বিয়ে হলে আপনাদের ধার মাড়াবে না!

চুল বাঁধা শেষ হলো…শচী বললে—আজ আসি মাসিমা! দেখছেন তো, আপনাদের মেয়ে কি রকম তাড়া দিচ্ছে! এখন থেকে ননদের উপর তদ্বি দেখছেন!

হেসে মা বললেন—দেখছি মা! তা আমাদের জামাই কবে এখানে আসছেন শিলং থেকে?

ফশ করে চাঁপা দিলে এ-কথার জবাব। হাসতে হাসতে চাঁপা বললে—আর তিন-চার দিনের মধ্যেই তিনি শিলং থেকে এখানে এসে পৌঁছুবেন। তারপরই…জানো মা, দিদি তাঁকে রোজ চারপাতা পাঁচপাতা করে চিঠি লেখে আর তিনিও রোজ শিলং থেকে দিদিকে যে-চিঠি লেখেন, এক একটা বস্তা যেন! কথাটা বলে চাঁপা হাসলো।

হাসতে হাসতে শচী বললে—তোর খুব হিংসে হয়, না? বাসু তোকে চিঠি লেখে না…তুই বাসুকে চিঠি লিখতে পারিস না!

ঘাড় বাঁকিয়ে হাসতে হাসতে চাঁপা বললে—বয়ে গেছে আমার চিঠি লিখতে!

শচী তাকালো মায়ের দিকে, বললে—জানেন মাসিমা, বাসু রোজ আমাকে একখানা করে চিঠি লেখে আর প্রত্যেক চিঠিতে আমাদের কথা, আপনাদের কথা, সকলের কথা থাকে, থাকে না শুধু চাঁপার কথা। তাই ওর এত রাগ! বলে শচী চাঁপার গালটা দিলো টিপে।

সরে গিয়ে চাঁপা বললে—করো তুমি এখানে রঙ-তামাসা…আমি চললুম। বলে চাঁপা হনহন করে সদরের দিকে এগিয়ে চললো।—ওরে দাঁড়া, দাঁড়া চাঁপা, আমি যাচ্ছি…বলে শচী ছুটলো চাঁপার পিছনে।

দক্ষিণেশ্বরের বাড়ী…বেলা প্রায় তিনটে।

কিরণ শিলং থেকে ফিরেছে…অত্যন্ত ক্লান্ত! নাওয়া-খাওয়া সেরে

বিছানায় পড়ে নিদ্রার চেষ্টা···বাসু সারাক্ষণ ঘ্যান্ ঘ্যান করছে—তুমি এখানে মিথ্যা দেরী করছো কিরণদা! আজই রাধানগরে যাও···আবার তো কাণপুরে ছুটতে হবে। দুদিন তবু সেখানে বিশ্রাম!

কিরণ বার-বার এক জবাব দিচ্ছে—আমার বিশ্রামের জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। আমি বুঝি, তুমি কেন আমাকে সেখানে চালান করতে চাও! আরে, তোমার দিদি যখন এ-ব্যাপার সম্বন্ধে কোনো কথা আমাকেও খোলসা করে লেখেনি, তখন বুঝছি···ইত্যাদি।

কিরণ এখন আরাম করে শুয়ে চোখ বুজেছে—সেখানে আগাগোড়া ঘোরাঘুরি এবং দেখাশুনার পরিশ্রম···তারপর দীর্ঘ আসা···ব্যস্তবাগীশ মানুষ···যাওয়া-আসার হাঙ্গামায় তার চোখে ঘুমের এতটুকু ছায়া পড়েনি ···এখন পূর্ণ বিশ্রাম! দু-চোখে ঘুম···রাত্রের ট্রেণে আবার রাধানগর যাওয়া আছে! এখন ঘুম আর ঘুম···

বাসুর মনে অস্বস্তির সীমা নেই! যে-করে' একা এখানে দিন কাটছে! হয়তো কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য হতো না—একাই সে বরাবর থেকে এসেছে! কিন্তু হঠাৎ এই আলোর ঝল্‌কনি···ক্ষণেকের জন্য চাঁপাদের সঙ্গে···তাই তার প্রাণ সব সময়ে [illegible] করছে যেন! কিরণকে মনের এ আক[illegible] বলে চেষ্টা করছে—কিন্তু বলতে গিয়ে একটি কথাও [illegible] পারছে না! কে যেন বাসুর গলাখানা জোরে চেপে ধরছে!

কিরণকে শুতে দেখে সে বসলো জানলার ধারে···কখনো বারান্দায় গিয়ে উদাস নয়নে আকাশের পানে চেয়ে কত কি ভাবে···কখনো অধীরভাবে ঘরে-বারান্দায় পায়চারি করে! হঠাৎ অসহ্য বোধ হলো—কিরণের বিছানার পাশে এসে মৃদুকণ্ঠে ডাকলো—কিরণদা···

কিরণ তখনো ঘুমোয়নি…ঘুমের ধ্যানে দু-চোখ বুজে বিছানায় পড়ে আছে—বাসুর ডাকে সাড়া দিলে না।…

বাসু আবার ডাকলো—কিরণদা…

কিরণের সাড়া নেই।

বাসু আবার ডাকলো, আবার ডাক, আবার…তবু কিরণ সাড়া দেয় না! বাসুর মনে অধীরতা সীমা লঙ্ঘন করে চললো। কিরণকে ঠেলা দিয়ে অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে বাসু আবার ডাকলো—কিরণদা… ও কিরণদা…শুনচো?

কিরণ চোখ খুললো…চোখে দারণ বিরক্তি। বালিশ থেকে মাথা না তুলে বাসুর পানে চেয়ে কিরণ বললে—নাঃ, মুস্কিল করলে! আমাকে তুই ঘুমোতে দিবিনে? ওদিকে মাসখানেক ধরে কি ধকল না গেছে! তারপর এই লং জার্নি…আজ রাত্রের ট্রেণে আবার রাধানগরে পাড়ি!

মিনতিভরা কণ্ঠে বাসু বললে—না, না…তুমি ঘুমোও না…তোমার ঘুমে আমি ব্যাঘাত করতে চাই না! মানে, আমি শুধু বলছিলুম…

ঝাঁকি দিয়ে বিছানায় উঠে বসলো কিরণ…হাত নেড়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বললে—বলো, বলো, বলো, কি তুমি বলবে।

বাসু একটু অপ্রতিভ হলো। কোনোমতে বাসু বললে—না, মানে, আমি বলছিলুম, আমিও তোমার সঙ্গে রাধানগরে যাই! মানে, বাবাকে অনেকদিন দেখিনি কিনা, তাঁর জন্য মনটা কেমন…

বাধা দিয়ে কিরণ বললে—উতলা হয়েছে? ওরে আমার পিতৃভক্ত রামচন্দ্র রে! তাই বুঝি এই খাতাখানা…বলে বালিশের নীচে থেকে বাঁধানো রুলটানা ছোট একখানা খাতা বার করে সে-খাতার একখানা পাতা খুলে কিরণ পড়লো একটা কবিতার ছত্র—

জীবন আমার চম্পকময়

চাঁপার বিহনে কিছু নয়! কিছু নয়!

চাঁপারে হৃদয় স'পি চাঁপা-চাঁপা নাম জপি···

এই পর্য্যন্ত পড়ে খাতা বন্ধ করে কিরণ বললে—খাতা ভর্ত্তি দেখছি! রাশ-রাশ পদ্য লিখেছো! সবগুলোতে শুধু চাঁপা আর চাঁপা! চাঁপার জন্য প্রাণ আকুল! কৈ, বাবার জন্য কোনো পদ্যে আকুলতার এতটুকু চিহ্ন দেখছি না তো!

কিরণের হাতে পদ্যর খাতা দেখে বাসু একেবারে এতটুকু! কম্পিত স্খলিত কণ্ঠে বাসু বললে—আমার এ খ্-খ্-খ্-আতা···বলে খাতা নিতে হাত বাড়ালো।

খাতাখানা বালিশের নীচে গুঁজে বালিশটা জোরে চেপে ধরে কিরণ বললে—এ খাতা পাবে না···আমি রাধানগরে নিয়ে যাচ্ছি তোমার বাবাকে দেখাবো। দেখিয়ে বল্‌বো, আপনার ছেলের মন ভয়ানক আকুল···এক মিনিট ত্বর সইছে না! বিয়েটা চট্‌পট্···

বাসুর ভালো লাগলো না! বাসু বললে—না, সত্যি নয়, কিরণদা! এর একটা হেস্ত-নেস্ত না হলে কতদিন আমি আর এমন···

কিরণ বললে—আরে, সবুর তোমায় করতেই হবে। আমি সেখানে যাই···গিয়ে সেখানকার হাওয়া বুঝি···তারপর···

নিশ্বাস ফেলে বাসু বললে—ঐ হাওয়া! দিদির চিঠিতে সব কথা থাকে! থাকে না কেবল ঐ হাওয়ার কথাটুকু!

কিরণ বললে—তার মানে, সেখানকার আকাশ এখনো মেঘাচ্ছন্ন··· সু-বাতাস বইতে সুরু করেনি, তাই।···হলো? প্লীজ···প্লীজ, এবার দয়া করে আমাকে একটু ঘুমোতে দাও। তোমার হা-হুতাশ এখন··· বলে কিরণ শুয়ে পড়লো।

নিশ্বাস ফেলে বাসু বললে—তুমি ঘুমোও। বলে বাসুর গমন-উদ্যোগ।

তার দিকে চেয়ে কিরণ বললে—ধন্যবাদ। বলে কিরণ চোখ বুজলো।

.

সেদিন রাধানগরে মথুরামোহনের মনেও একটি সুর বাজছে—চাঁপা ...চাঁপা...চাঁপা! আরতির সময় মন্দিরে ফুলের গন্ধ...ধূপ-ধূনোর গন্ধ...দীপে-দীপে মন্দির আলো হয়ে আছে! কালো কষ্টিপাথরের তৈরী শ্যামসুন্দরের মূর্ত্তি যেমন ঝকমক করছে, পাশে সোনা-রূপোর তৈরী শ্রীরাধার মূর্ত্তিও তেমনি ঝকঝক করছে!...মথুরামোহনের কেবলি মনে হয়েছে, বিগ্রহের মুখে আনন্দের দীপ্তি·· এমন দীপ্তি আগে কখনো দেখেছেন বলে মনে পড়ে না! আরতির সময় তাঁর চোখের দৃষ্টি একবার বিগ্রহের পানে...পরক্ষণে চাঁপার পানে সঞ্চালিত হচ্ছে! চাঁপা আরতির সময় বিগ্রহের পাশে দাঁড়িয়ে চামর দুলোচ্ছে...সে-কাজে চাঁপা একেবারে তন্ময়! বিগ্রহের উপর চাঁপার একাগ্র-দৃষ্টি...ধ্যানে অর্দ্ধ-নিমীলিত...বিশ্ব-পৃথিবীর আর সব যেন চাঁপার মন থেকে ছায়ার মতো সরে মিলিয়ে গেছে! দেখে মথুরামোহনের বুকখানা দুলে দুলে উঠছে! মনে হচ্ছে, চাঁপা নয়—যেন একখানি ছবি! এমন ছবি কোথায় যেন একটিবার শুধু দেখেছেন! কবে? কোথায়? পূজার আরতি থেকে মন উধাও হয়ে ভেসে চলেছে! কবে...কোথায় দেখা সেই ছবির সন্ধানে! মনে পড়লো, একখানা বিলিতী ছবি...এক কিশোরী... বিদেশিনী...যীশুর ক্রশের সামনে কৃতাঞ্জলিপুটে ভাবাকুল নয়নে চেয়ে আছে ··কিশোরীর মুখে অপরূপ জ্যোতি!...বিদেশিনী! মন তখনই স্মৃতির গহন থেকে পিছলে সরে এলো!

আরতির পর চাঁপা আর শচী বাড়ীর দিকে গেল। মথুরামোহন

অপলক নেত্রে ওদের পানে চেয়ে। চাঁপা আর শচী দৃষ্টির বাহিরে অদৃশ্য হলে নিশ্বাস ফেলে মথুরামোহন বললেন—মন্দ কি! মেয়েটি···আমার চাঁপা-মাকে দেখে আমার কি মনে হয়, জানো বাচস্পতি?

বাচস্পতি তাকালেন মথুরামোহনের দিকে। মথুরামোহন বললেন—নিজের মায়ের কথা মনে পড়ে! তখন আমি একেবারে শিশু···মনে পড়ে, বোধ হয়, দোলের দিনে···না, না, আমাদের শ্যামসুন্দরের ঝুলন-পূর্ণিমা···আরতির সময় মাকে দেখেছিলুম এই মন্দিরে···মা চামর দুলোচ্ছিলেন। আজ চাঁপা-মাকে দেখে আমার নিজের মাকে কেবলি মনে পড়েছে!

বাচস্পতি বললেন—হুঁ। কে জানে, হয়তো তিনিই এ-জন্মে আপনার চাঁপা-মা হয়ে···

মথুরামোহনের কণ্ঠে বাষ্পভার···তিনি বললেন—সে-মা চলে গেছেন···তাঁকে রাখতে পারিনি! আমার চাঁপা-মাও···

তাঁর কথা শেষ হলো না···বাষ্পোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ রুদ্ধ হলো।

বাচস্পতি বললেন—আপনার চাঁপা-মাকে রাখতে হলে ওঁকে সুমধুর সম্পর্কের বন্ধন···

মথুরামোহন চমকে উঠলেন, বললেন—কি করে?

বাচস্পতি বললেন—বাসুর সঙ্গে বিবাহের বন্ধন দিয়ে! না হলে উনি কি-করেই বা থাকেন?

মথুরামোহনের বুকের মধ্যে বিদ্যুতের চিকিমিকি! তিনি বললেন—কিন্তু কি করে তা হবে? অষ্টাদশী কিশোরী···

বাচস্পতি বললেন—সমস্যা!

মথুরামোহন বললেন—ঠিক বলেছো, বাচস্পতি—সমস্যা!

তারপর রাত্রি সাড়ে ন'টা। মথুরামোহনকে চাঁপা চৈতন্যচরিতামৃত

পড়ে শোনালো—তারপর তাঁকে খাওয়ানো ! শচী আর চাঁপা দুজনে বসে কত কথা, কত গল্প ! তারপর বিছানা ঠিকঠাক করে দিয়ে মথুরামোহনকে শোয়ানো···চাঁপা তাঁকে বিশল্য-করণীর সরবত খাওয়ালো। মথুরামোহন বিছানায় শুলেন। শচী মশারি গুঁজে দিলে···বিশল্য-করণীর পাত্র চাঁপার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মথুরামোহন বললেন চাঁপাকে—তুমি আমাকে ঠিক সারিয়ে তুলবে, মনে হচ্ছে, মা। তোমাকে ছেড়ে আমার স্বচ্ছন্দ থাকা··· শচী এখন পরের জিনিষ! তুমি· তুমিও চলে যাবে মা···চিরকাল তো আমার কাছে থাকবে না ! তাই মনে হয়···

বাধা দিয়ে শচী বললে—কেন বাবা, মনে করলেই তো তুমি চাঁপাকে চিরকালের জন্য···

নিশ্বাস ফেলে মথুরামোহন বললেন—কিন্তু কি করে তা সম্ভব ? ওঁর বিয়ে হবে · সংসার হবে···কোথায় কার ঘরে চলে যাবেন !···শ্যামসুন্দরের ইচ্ছা !···আচ্ছা, তোমরা তাহলে এসো। আমি এখন···

মথুরামোহন শুয়ে পড়লেন। শচী তাকালো চাঁপার দিকে···চাঁপা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খাটের মশারি গুঁজতে গুঁজতে শচী বললে—তুমি ঘুমোও, বাবা। শরীরে কোনোরকম বেজুত··· ?

মথুরামোহন বললেন—না।

শচী বললে—আমরা তাহলে আসি।

মথুরামোহন বললেন—হ্যাঁ, এসো।

ঘরের বাতি নিবিয়ে শচী আর চাঁপা এলো বাহিরে বারান্দায়।

মথুরামোহনের ঘরের দুদিকে দুখানা ঘর···এক-লাইনে।···এ-তিনখানা ঘরের সামনে টানা বারান্দা। ওদিককার ঘরে শচী শোয়···এদিককার ঘরে চাঁপা। মথুরামোহনের ঘরের সামনে বারান্দায় বিছানা পেতে বটা শোয়। মানে, বটার ঘুম এবং কর্ত্তার পাহারাদারি—দু-কাজ চলে তার।

মথুরামোহনের ঘর থেকে বেরিয়ে শচী আর চাঁপা এলো চাঁপার ঘরে। চাঁপাকে শচী বললে—শুনলি তো, তোর উপর বাবা কতখানি··· আমার মনে হলো, বলি, বাসুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে চিরকালের মতো কাছে রাখো। বলতে পারলুম না!···কাল বাচস্পতিদাকে দিয়ে বলাবো। বলিয়ে আমিও বেশ জোর করে···তার উপর উনি আসছেন কাল··· না হয় পরশু! আমি এখান থেকে চলে যাবার আগে যেমন করে পারি— বুঝলি চাঁপা···

চাঁপা নির্বাক, মৌন। কথার পর কথা দিয়ে শচী ভবিষ্যতের ছবি এঁকে চলেছে···

ঢং ঢং করে ঘড়িতে এগারোটা বাজলো। শচী বললে—না, আর নয়। শুয়ে পড়্। আমিও শুতে যাই।

শচী চলে গেল নিজের ঘরে শুতে। চাঁপা দাঁড়ালো খোলা জানলার সামনে। এত-বড় বাড়ী···রাত এগারোটাতেই নিশুতি। কাজকর্ম্মের ভিড় নেই···লোকজন সব খাওয়া-দাওয়া সেরে শোবার উদ্যোগ করছে। এমনিই হয়···বাঁধা-রুটিনে কাজ।

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে চাঁপা আকাশের পানে চেয়ে···আকাশে এক ফালি চাঁদ···কালবৈশাখীর টুকরো-টুকরো কালো মেঘ, স্থির নয়· চঞ্চল হয়ে আকাশের বুকে ছুটোছুটি করছে···যেন নিরালায় তাদের লুকোচুরি

খেলা চলেছে! কখনো চাঁদকে ঢেকে দিচ্ছে, পরক্ষণে আবার চাঁদের উপর থেকে আবরণ খুলে নিয়ে ছুটে চলেছে! আকাশে আলো আর ছায়া··· ছায়া আর আলোর হিজিবিজি! চাঁপার মনেও এমনি আলো আর ছায়া···ছায়া আর আলো! সে আলো-ছায়ায় কত কথা···কত আশার আলোর কুঁচি···আবার নৈরাশ্যের কালো মেঘের টুকরো! কোনোটা থিতুতে পারছে না! ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ছুটে চলেছে! সেগুলোর মধ্যে তন্ময় হয়ে দুনিয়া ভুলে জানলার গরাদ ধরে চাঁপা দাঁড়িয়ে আছে···

কখন এগারোটা বেজে গেছে···এগারোটার পর বারোটা···তারপর ঢং করে একটা বাজলো। চাঁপার হুঁশ হলো—এত রাত হয়েছে··· তাইতো! ফিরে শুতে যাবে, বাহিরে বাড়ীর কম্পাউণ্ডের পর উঁচু পাঁচিলটা···পাঁচিলের গায়ে বেশ বড় একটা ঝাঁকড়া আমগাছ—সেই গাছের ডালপালা নড়ে উঠলো! চাঁপা সেদিকে তাকালো। তাকিয়ে দেখে, কে-একজন মানুষ···বাড়ীর ফটক বন্ধ···ঐ উঁচু পাঁচিল টপ্‌কে ভিতরে আমগাছের ডাল ধরলো! ধপ্‌ করে কি একটা জিনিষ পড়লো গাছের নীচে! লোকটা নিঃশব্দে হুঁশিয়ার হয়ে আস্তে আস্তে কম্পাউণ্ডের মধ্যে নামলো।

দেখে চাঁপা একেবারে ভয়ে কাঠ! চোর? বারান্দায় বটা ঘুমোচ্ছে···তাকে ডাকবে? তখনি মনে হলো, না, আগে দেখি, কোথায় যায়···কি করে লোকটা!

চাঁপা তেমনি দাঁড়িয়ে দেখছে, দেখছে···লোকটা কম্পাউণ্ডে নেমে গুড়ি মেরে মেরে বাড়ীর দিকে আসছে। ধপ্‌ করে যে-জিনিষটা পড়েছিল পাঁচিলের গায়ে, সেটা নিয়ে বুকে চেপে ধরেছে। চাঁপার সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চরেখা···দেহের রক্ত সোঁ-সোঁ করে মাথায় উঠছে! ছুটে গিয়ে বটাকে ডাকবে, পারলো না! সে কাঁপছে···একটা হিমেল

শিহরণ! পা দু'খানা অবশ...কে যেন স্ক্রুপ দিয়ে মেঝেয় এঁটে দেছে! কাঠ হয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে...চোখের সামনে সব কেমন ঝাপ্‌সা... শুধু কান দুটো—সমস্ত ইন্দ্রিয় দুই কানে কেন্দ্রিত হয়ে সজাগ! চাঁপা শুনছে, শুনছে...কোনো শব্দ?

তারপর যা হলো...যেন সিনেমার ছবি! পর-পর টুকরো-টুকরো কটা ঘটনা মিলে...দুম্ করে বোমা ফাটলো যেন!

ঘরের বাহিরে বারান্দার কোলে বাহিরের দিকে সার-সার কটা সুপুরি গাছ...হঠাৎ সেদিকটায় বারান্দার উপর ঝুপ্ করে শব্দ...সঙ্গে সঙ্গে বটার চীৎকার—চোর...চোর...

সে-শব্দে চাঁপার চেতনা জাগলো। তাইতো, চোর যদি ঘরে ঢোকে? সে ছুটে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করবে, চোর ঝড়ের বেগে চাঁপার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো—ঢুকেই চাঁপাকে একরকম ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘরের দরজা দিলে বন্ধ করে!

চাঁপা চীৎকার করে লোক ডাকবে, অবসর মিললো না...দরজা বন্ধ করেই চোর তার মুখখানা চেপে ধরলো। ধরে অস্ফুট কণ্ঠে চোর বললে—চুপ্! আ—আ—আমি...ব্—ব্—ব্ আমু!

চাঁপা যেন বেহুঁশ...অচেতন! কি হলো, কি হচ্ছে...কি হবে... জানে না! কানে শুধু শুনছে বাইরের বারান্দায় বটার তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠ—চোর, চোর...একেবারে আমার বুকের উপর পা...ধরেছিলুম! পালালো · তার পায়ের একটা জুতো ফেলে! এই সে জুতো! পাক্‌ড়ো... পাক্‌ড়ো! সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে লোকজনদের ডাকা—গণ্‌শা...দামু... পাঁচু...চৈতন...হনুমান সিং · আরে...জল্‌দি আও সব! চোর! জলদি!

তার চীৎকারে নিস্তব্ধ নিঝুম বাড়ীখানা চকিতে দুলে উঠলো! যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্প! ঘুম ভেঙে টলতে টলতে মথুরামোহন এসে দাঁড়ালেন

বারান্দায়···শচী এসে দাঁড়ালো বাপের পিছনে। ভয়ে সে কাঁপছে!··· নীচে থেকে হুম্‌হুম্‌ শব্দে ছুটে এলো যে যেখানে ছিল···বটার ডাকে ঘুম ভেঙ্গে···গণ্‌শা, দামু, পাঁচুর দল ···তাদের পিছনে দারোয়ান হনুমান সিং।

এসেই সকলের প্রশ্ন—কৈ? কৈ? কোথা? কাঁহা গিয়া? কিধর ঘুষা?

বটার হাতে চোরের জুতোর পাটি—বটা উঠে দাঁড়িয়েছে। চাঁপার ঘরের দিকে দেখিয়ে বটা বললে—ওই···ওই ঘরে···নতুন-দিদিমণির ঘরে সেঁধিয়েছে।

মথুরামোহন সভয়ে বললেন—অ্যাঁ! আমার চাঁপা-মা···

শচী একেবারে কাঁটা···শচী বললে—তুই দেখেছিস?

বটা বললে···বেশ জোর গলায়—হ্যাঁ, দেখেছি।

শচী আর মথুরামোহন তাকালেন চাঁপার ঘরের দিকে। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দেখে তুজনে চমকে উঠলেন! কোনো ঘরের দরজা রাত্রে বন্ধ নয়—খোলা থাকে! তুর্গের মতো সুরক্ষিত পুরী···তা ছাড়া এখানকার চোরের এমন তুঃসাহস হতে পারে না, জমিদার-বাড়ীর দোতলায় উঠবে! ঘরের দরজা বন্ধ দেখে মথুরামোহন শিউরে উঠলেন, —আমার চাঁপা-মার গলা টিপে যদি···

শচীর তুচোখ···পুতুলের আঁকা চোখের মতো! সে ডাকলো চেঁচিয়ে ঘরের দিকে চেয়ে—চাঁপা···

দরোয়ান হনুমান সিং এবং চাকরদের অক্ষৌহিণী এসে কতকগুলো পুতুলের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে! যেন মিলিটারী···হুকুম না পেলে নড়বে না! নড়তে পারে না!

বাহিরে যখন এমনি চাঞ্চল্য, ঘরের মধ্যে তখন···

ভয়ে শিউরে বাসুর পানে চেয়ে চাঁপা বললে—আপনি! কিন্তু··· কিন্তু···এমন করে আপনি···

দুচোখে যেমন ভয়, তেমনি আবেগ···অস্ফুট কণ্ঠে বাসু বললে—মানে, একা-একা সেখানে থাকতে পারলুম না···তোমার জন্য···তোমার জন্য বড্ড মন-কেমন···

তারপর বাসু আরো কি বললে—চাঁপার কানে গেল না। তার কানে এসে লাগলো বাহির থেকে শচীর ডাক—চাঁপা···চাঁপা···

চাঁপা ভয়ে সিঁটিয়ে উঠেছে! এখন উপায়? তার দুচোখে জল এলো ঠেলে! এমন নিরুপায়তা···বাসুর দিকে চেয়ে চাঁপা বললে অশ্রুসজল কণ্ঠে—কি হবে?

বাসুর বুকের ভিতরটা ভয়ে ভরে উঠেছে! নিশ্বাস ফেলে খুব চাপা গলায় বাসু বললে—হুঁ, মুস্কিল!

বাহিরে ওদিকে শচীর ডাক···মুহুর্মুহু···সভয়ে আকুল কণ্ঠে—চাঁপা, চাঁপা···দরজা খোল্···আমরা···চাঁপা···আমরা···

বাহিরে বারান্দায় সকলে মঞ্চের অচল অভিনেতার মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছে···কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।···কারো নড়ন নেই···যেন নাট্যকার এ-নাটকে এখনও তাদের নড়বার কথা লেখেন নি···সকলে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছে।

মথুরামোহনের বুকে আতঙ্ক ঘনায়িত হলো! এত ডাকেও চাঁপা সাড়া দেয় না! এর মানে? আকুল নয়নে শচীর পানে চেয়ে তিনি বললেন—ব্যাপার কি? কোনো সাড়া নেই!···গলা টিপে আমার চাঁপা-মাকে মেরে ফেললো না তো!

এ-কথায় শচীর চোখে জল-ধারা। বাপের দিকে চেয়ে শচী বললে—কি হবে, বাবা?

শচীর এ-কথায় মথুরামোহনের বুকে জমিদারের সেই হারিয়ে-যাওয়া প্রতাপ গর্জ্জন করে উঠলো! তিনি ডাকলেন—হনুমান সিং···

—হুজুর! বলে মিলিটারী কায়দায় হনুমান সিং সামনে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে মনিবকে দিলে সেলাম।

মথুরামোহন হুকুম দিলেন—দর্‌ওয়াজা তোড়ো।

ব্যস! এ হুকুম যেমন পাওয়া, হনুমান সিং ডন-বৈঠক করে নিজের পেশীগুলোকে নিলে চাঙ্গা করে···তারপর গণ্‌শা পাঁচুদের দিকে চেয়ে সে বললে—আও ভাই সব···জয় মহাবীর···

সকলে তখন—মারো জুয়ান হেঁইয়ো···ঔর ভি থোড়া হেঁইয়ো—জোর্‌সে মারো হেঁইয়ো···

সেকালের দরজা···খাঁটী জিনিষ···এখনকার কণ্ট্রাক্টরের তৈরী বা হঠাৎ-বাবুদের বড়-মানুষী চালিয়াতির দরজা নয় যে টোকা মারলেই চিড় খাবে! লোকজনের ধাক্কায়, ঠেলায়, লাথিতে দরজা খোলে না··· শুধু দুম্ দুম্ দম্ দম্ শব্দ! ঘরের মধ্যে চাঁপা···পুরাণের অহল্যার মতো চেতনা হারিয়ে পাষাণ হতে চলেছে! বাসুর আতঙ্ক···বিড়ালের খপ্পরে ইঁদুরও এমন আতঙ্কগ্রস্ত হয় না! বাসু কাঁপছে···চারিদিকে তাকাচ্ছে! মনে হচ্ছে, জানলার নীচে ঘরের নালি···জানলার গরাদের ফোকর···তার মধ্য দিয়ে···হায়রে, বাসু না হয়ে সে যদি পাখী হতো, মাছি হতো, মশা হতো···

ঘামে যেন নেয়ে উঠেছে! চাঁপা কাঁপছে না, যেন ষ্টাচু! সে যেন কুরু-সভায় দুঃশাসনের কবলে পড়েছে···সেই দ্রৌপদী! বাহিরে মথুরামোহন দুচোখ এত-বড় করে তাকিয়ে আছেন···বুকে মুগুরের ঘা···তবে কি? তাহলে? শচীর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা দুলছে···বড় ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো।

মথুরামোহনের বুকের মধ্যে কবেকার ঘুমিয়ে-পড়া সেই পৌরুষ··· তিনি হাঁকলেন—লোহার ডাণ্ডা মেরে ভেঙে ফ্যাল্ দরজা!

তাঁর সে রুদ্রকণ্ঠ ঘরের মধ্যে ওখানে বাসুর কানে বাজলো গর্জ্জনের মতো! সে হুঙ্কারে চাঁপার জাগলো চেতনা! সে দুপা এগুলো দরজার দিকে—দেখে বাসু তার হাতখানা প্রাণপণে চেপে ধরলো, অস্ফুট-কণ্ঠে কোনোমতে সে বললে—একটু দাঁড়াও···

বলেই চাঁপার পালঙ্কের নীচে বাসুর ঢোকবার প্রয়াস। দরওয়ান হনুমান সিং ওদিকে লোহা-বাঁধা বাঁশের মোটা লাঠির বেশ জোরে কটা-ঘা মারলো দরজায়। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র-চালিতের মতো চাঁপা খুট করে হুড়কো খুলে দরজার সামনে দাঁড়ালো···রোদে-শুকনো ম্লান নলিনী যেন ঝড়ের দোলায় পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো!

বাহিরে সকলে স্তম্ভিত! চকিত-ক্ষণ! শচী ছুটে এসে চাঁপাকে জড়িয়ে ধরলো—যেন হারামণি ফিরে পেয়েছে, এমনি আবেগে। সে ডাকলো—চাঁপা···

এ-ডাকে চাঁপার চেতনা পরিপূর্ণভাবে জেগে উঠলো···কি হয়েছে···এবং কি হবে···যেন ঝড়ের দোলায় সে দুলে উঠলো! শচীর বুকে মুখ চেপে সজল কণ্ঠে চাঁপা বললে—দিদি···

সে যেন কূলহারা সাগরের বুকে ভেসে চলেছিল···শচীর বুকে যেন কূল পেয়েছে! মথুরামোহন এগিয়ে এলেন···চাঁপাকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ···সস্নেহে চাঁপার পিঠে হাত রাখলেন, হাঁ, বেঁচে আছে! কোথাও চোট্? করুণ আর্ত্ত কণ্ঠে তিনি ডাকলেন—মা···

চাঁপা মুখ তুললো না শচীর বুক থেকে···ঘাড় একটু ফেরালো—চাঁদের জ্যোৎস্না চাঁপার মুখে···সে-আলোয় মথুরামোহন লক্ষ্য করলেন,

চাঁপার চোখে জল···বেদনায় চাঁপার মুখ যেন···রুদ্ধ কণ্ঠে মথুরামোহন বললেন—চোর ! তোমাকে কোনো রকম···

এ-কথার কী জবাব চাঁপা দেবে ? জবাব নেই ! শচীর বুকে চাঁপা মুখ গুঁজলো।

মথুরামোহন একটা নিশ্বাস ফেললেন, ফেলে তাঁর লোকজনের দিকে তাকালেন। বললেন—তোরা ভাখ্।

চাঁপাকে জড়িয়ে ধরে শচী তাকে নিয়ে বারান্দায় মাঝামাঝি এসে দাঁড়ালো। চাঁপার পিঠে হাত রেখে শচী বললে—তোমার ঘরে চোর··· বলে চাঁপার মুখখানা শচী তুলে ধরলো। চাঁপার চোখে নিরুপায় অসহায়ের দৃষ্টি।

মথুরামোহন বললেন—তুমি ভাখোনি মা ? চাপা মাথা নামালো। তার মুখে কথা নেই।

মথুরামোহন তখন বটার দিকে চেয়ে বললেন—তুই···

বটা বললে—এই ঘরে ঢুকেছে···আমি চোখে দেখেছি···স্পষ্ট···হ্যা··· আলবৎ ঢুকেছে !

অক্ষৌহিণীর দল মহা-উৎসাহে বলে উঠলো—তাহলে চলো, দেখি···

হৈ-হৈ শব্দে তারা ঢুকলো ঘরের মধ্যে। ঢুকে সন্ধান—কৈ ? কোথায় ? সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার—ঐ···ঐ···ঐ···শালা খাটের তলায় ঘুপটি মেরে···বার কর্ টেনে···মার্···মার্ বেটাকে···

যেন আটকড়াইয়ের কুলো পিটছে···ঘরের মধ্যে তেমনি শব্দ ! বাহিরে বারান্দায় চাঁপা থর্থর্ করে কাঁপছে, এখনি বুঝি পড়ে যাবে ! শচী তাকে সবলে চেপে ধরে আছে ! চাঁপাকে নিয়ে গিয়ে কোথাও বসাবে, কি, শচীর বিছানায় শুইয়ে দেবে···অর্থাৎ কি করবে, খেয়াল নেই ! মথুরামোহন হতভম্ব···ঘরের মধ্যে লোকজনের চীৎকার—বার্

কর্‌···মার্‌···মার্‌! বেটা! বাঘের ঘরে ঘোঘ। এবং তাদের এই চীৎকারের মধ্যে অস্ফুট আর্ত্তকণ্ঠ—ওঃ···ওঃ···ওফ্‌···

মারতে মারতে চোরকে টেনে সকলে বারান্দায় নিয়ে এলো।··· বারান্দায় আলো জলছে···তার উপর জ্যোৎস্না। চোরকে ঠেলে বারান্দায় ফেলে মনিবের সামনে তাকে বেশ এক-ঘা দেবে বলে বটা ঘুষি বাগিয়েছে···চোর জুল্‌জুল্‌ করে তাকালো বটার দিকে! বটা শিউরে লাফিয়ে উঠলো—আরেরেরেরে···দাদাবাবু!···

চাঁপাকে ছেড়ে শচী এলো এগিয়ে। বাসুর দিকে চেয়ে শচী বললে—তুই!

মথুরামোহনের স্তম্ভিত ভাব কাটলো। তিনিও এলেন এগিয়ে··· বললেন—বাসু!

সঙ্গে সঙ্গে মথুরামোহনের মনে চিন্তার তুফান··· ঢেউয়ের উপর ঢেউ। তাঁর ললাট কুঞ্চিত···তিনি বললেন—হুঁ!···হঠাৎ এমন চোরের মতো এত রাত্রে এমন নিঃশব্দে তোমার বাড়ী আসার মানে?

বাসুর মাথা আরও নুয়ে এলো···মাথা যেন কাঁধ থেকে ছিঁড়ে খশে পড়বে!

মথুরামোহন বিচক্ষণ ব্যক্তি। এত বড় জমিদারী চালিয়ে আসছেন। বুঝলেন, কোথাও রহস্য আছে! লোকজনের সামনে নয়! তাদের তখনি হুকুম দিলেন—তোরা যা এখান থেকে।

লোকজন চলে গেল···মথুরামোহনের ভ্রূ কুঞ্চিত···বাসুর দিকে চেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে তিনি বললেন—বলো···

বাসুর মুখে কথা নেই···মাথা তেমনি নুয়ে আছে!

মথুরামোহনের কণ্ঠ উঠলো আরো উঁচু পর্দ্দায়। তিনি বললেন—বলো, জবাব দাও।

তবু বাসুর দুমড়োনো-মুচড়োনো অবস্থা…মথুরামোহনের একাগ্র দৃষ্টি বাসুর উপর নিবদ্ধ। মথুরামোহন বললেন—এ-বাড়ীতে তোমার নিজের ঘর নেই ?…বলো!

বাসু নিশ্চল…নিস্পন্দ…নির্ব্বাক।

মথুরামোহন বললেন—নিজের ঘরে না গিয়ে এই কিশোরী কুমারী… এত রাত্রে চোরের মতো এসে এঁর ঘরে ?…বলো…(বাসু তবু তদবস্থ) —জবাব দাও।

বাসুকে মাথা তুলতে হলো…মাথা তুলতেই তার দৃষ্টি প্রথমে চাঁপার উপর! চকিত মাত্র…পরে মথুরামোহনের দিকে। মথুরামোহনের দৃষ্টিতে যেন ধারালো বঁড়শি! সে-বঁড়শি মনের গহন থেকে কতকগুলো কথা গেঁথে নিয়ে এলো! কোনোমতে বাসু বললে—আমি·· আমি…মানে, চাঁ-চা-চা-আঁপাকে একটা কথা…

বাসুর কথা শেষ হলো না মথুরামোহনের রুদ্র কণ্ঠস্বরের আঘাতে!

মথুরামোহন বললেন—চাঁপা! চাঁপার কথা!…চাঁপাকে তুমি জানো ?

মথুরামোহনের চোখে ঐ দৃষ্টি…কণ্ঠে এই স্বর…যেন হিপ্‌নটিক্-মন্ত্র! বাসু পৃথিবী ভুলে গেল! নিজের অজ্ঞাতে সে বললে—আজ্ঞে…

মথুরামোহনের দৃষ্টিতে বিদ্যুতের বহ্নি…তিনি তাকালেন চাঁপার দিকে…ডাকলেন—চাঁপা…

সে-স্বরে মন্ত্র-চালিতের মতো চাপা তাকালো তাঁর দিকে। মথুরামোহন বললেন—বাসুকে তুমি…

মথুরামোহনের আহ্বানে চাঁপা তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। মথুরামোহনের চোখের দৃষ্টি অগ্নি-শলাকার মতো চাঁপাকে বিঁধলো যেন! চাঁপা মাথা নামালো…কোনো জবাব দিলে না।

মথুরামোহন ক' সেকেণ্ড নিস্পন্দ···নিশ্চল—তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—হুঁ! অনাচার!···আমার বাড়ীতে! তারপর কিছুক্ষণ তাঁর মনের মধ্যে ঝড়! মাথা নেড়ে মথুরামোহন বললেন—না, এ অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়া পাপ।—এরপর এ-বাড়ীতে তোমার আর স্থান হতে পারে না, বাসু।···চলে যাও তুমি এখান থেকে···যেখানে তোমার খুশী···যাও।

বাপকে বাসু জানে···শচীও জানে। শচী চুপ করে দাঁড়িয়ে···বাসু নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে গেল।

তারপর মথুরামোহন তাকালেন চাঁপার দিকে, বললেন—তোমাকে মা বলেছি!···সেবায় যত্নে আমার বুকে স্নেহ-মমতা জাগিয়ে তুলেছো!···এই পর্যান্ত বলে একটা নিশ্বাস! নিশ্বাস ফেলে আবার বললেন—কিন্তু না, তুমি কিশোরী···কুমারী···শরণাগত···আশ্রয় দিয়েছি···সে-আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করতে চাই না!···তবে কাল থেকে আমার শ্যামসুন্দরের সেবায় আর আমার কোনো কাজে তুমি হাত দেবে না।

১৯

রাত্রে যেন একটা মস্ত ঝড় বয়ে গেছে···সে-ঝড়ে সারা বাড়ীতে ছন্নছাড়া ভাব।

নিত্যকার মতো মথুরামোহন মন্দিরে এলেন। কখন সূর্য্যোদয় হয়েছে—পূজার কোনো আয়োজন নেই! মাহিনা-করা বামুন গোবিন্দঠাকুর মন্দির পরিষ্কার করছে! আরতির পুষ্পপাত্রে রাতের ক'টা বাসি ফুল—বিগ্রহের গলায় কালকের সেই বাসি মালা! নিত্য প্রাতে এসে মথুরামোহন দেখেন, বিগ্রহের কণ্ঠে সদ্য-গাঁথা তাজা মালা। আজ তা

নেই। মন্দিরে পুরুত-ঠাকুর সূর্য্য-স্তব আওড়াতে আওড়াতে সাজিতে ফুল তুলছেন। মন্দিরের সর্ব্বত্র দারুণ বিশৃঙ্খলা। তিনি বিরক্ত হলেন—বললেন—এ-কি...পূজার আয়োজন এখনো...

মোটা দেহ নিয়ে উঁচু হয়ে বসে পাঁচুঠাকুর চন্দন ঘষছে, কর্ত্তার কথায় মাথা তুলে সে বললে—আজ্ঞে, নতুন-দিদিমণি রোজ ভোরে এসে এ-সব করেন! বেলা হলো, তিনি এলেন না দেখে...

মথুরামোহনের মনে পড়লো, ঠিক! চাঁপাকে তিনি কাল নিষেধ করেছেন! নিশ্বাস ফেলে মথুরামোহন বললেন—ও! হুঁ...

মনে দারুণ অস্বস্তি...মথুরামোহন বসলেন মন্দিরের সিঁড়িতে।

রাত্রিটা শচীর কি ভাবে কেটেছে...

মথুরামোহনকে কোনোমতে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বটার উপর তাঁকে দেখবার ভার অর্পণ করে চাঁপাকে শচী নানা সান্ত্বনায় কোনোমতে নিজের ঘরে এনে শুইয়েছে। তারপর বাসু...মারের চোটে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত...হাঁটু ফুলে উঠেছে, গায়ে ব্যথা...তার সে-সব জখমে নিজের ট্রাঙ্ক থেকে আয়োডিন, আয়োডেক্স বার করে পরিচর্য্যা! মাথা কেটে গেছে, ওষুধ দিয়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা...হাতে-পায়ে ব্যাণ্ডেজ। বটার সাহায্যে বাসুকে ছাদের উপর চিলকোঠায় নিয়ে গিয়ে সেখানে তার বিছানার ব্যবস্থা। বাসুকে হুঁশিয়ার করে দেছে—এখানে চুপ করে পড়ে থাকবি, নড়বি নে...টু শব্দটি নয় মুখে! বটা এসে খাওয়াবে-দাওয়াবে। যেমন বাঁদুরে বুদ্ধি...থাকো তেমনি এই পিঁজরের মধ্যে।

ভোর থেকে শচী ভাবছে, কখন বাচস্পতিদা আসবে। আজ কিরণের আসবার কথা। এলে শচী যেন বাঁচে...

সকালে নিত্যকার মতো বাচস্পতি এলেন। তাঁকে ফটকে ঢুকতে

দেখে শচী নিঃশব্দে নেমে এলো। সিঁড়ির নীচে ল্যাণ্ডিংয়ে দুজনে দেখা। বাচস্পতিকে শচী রাতের বৃত্তান্ত খুলে বললো। শুনে নিশ্বাস ফেলে বাচস্পতি বললেন—তাই তো দিদি, মুস্কিলের কথা! নৌকোখানি দিব্যি ডাঙ্গার কাছাকাছি এসেছে! আর বাস্...

শচী বললে—ত্যাখো না, কাল রাত্রে বাবার মনটা বেশ যেন একটু...ভেবেছিলুম, তোমাকে দিয়ে আজ সকালে কথাটা পাকা করে ফেলবো! তা নয়...দুম্ করে হাঁদারাম কোথা থেকে এসে...

বাচস্পতি রীতিমত চিন্তিত...মুখে অনেকক্ষণ কথা নেই। তারপর বললেন—হুঁ। তা, কর্ত্তা কোথায়?

শচী বললে—মন্দিরের দিকে গেছেন।

—দেখি। বলে বাচস্পতি চললেন মন্দিরের দিকে।

শচী দোতলায় উঠবে, দেখে, হাতে ছোট বাণ্ডিল, চাঁপা নেমে আসছে। শচী প্রশ্ন করলে—কোথায় চলেছিস?

চাঁপা মলিন মুখে বললে—মার কাছে।

শচী অবাক্...বললে—তার মানে?

চাঁপা বললে—কাল রাত্তিরের পর এখানে থাকা...নিশ্বাসের বাষ্পে চাঁপার কণ্ঠ রুদ্ধ হলো।

চাঁপার হাত ধরে শচী সস্নেহে বললে—ক্ষেপেছিস! বাবার মেজাজ জানিস তো! গরম হতে যেমন সময় লাগে না, জুড়োতেও তেমনি! তাছাড়া জানিস তো, তোর উপর বাবার কতখানি...

চাঁপাকে শচী বোঝাতে লাগলো।

গাড়ী-বারান্দায় গাড়ী থামার শব্দ। ফিরে তাকিয়ে শচী দেখে, করুণ...গাড়ী থেকে নামছে। গাড়ীর মাথায় লগেজ।

গাড়ী থেকে নেমে মৃদু-হাস্যে কিরণ বললে—সুপ্রভাত···এসেই দুই সখীর মুখদর্শন!

সে-কথায় কাণ না দিয়ে শচী বললে—খুব সময়ে তুমি এসে পড়েছো!

এ-কথায় কিরণের বিস্ময়! সে বললে—কেন? ব্যাপার কি?

শচী বললে—বলবো···তুমি আগে এসে বসো তো!

চাকরকে ডেকে লগেজপত্র নামাতে বলে কিরণ আর চাঁপাকে নিয়ে শচী দোতলায় উঠবে, কিরণ বললে—সেখানে তোমার ভাই এক মুস্কিল বাধিয়েছে!

শচী বললে—মুস্কিল!

—হ্যাঁ। কাল থেকে সে নিরুদ্দেশ।

শচীর মুখে মৃদু হাসির রেখা!···শচী বললে—নিরুদ্দেশ নয়! সে এখানে এসেছে।

কিরণ চমকে উঠলো। বললে—এখানে?

শচী বললে—হ্যাঁ। সে যা কীর্ত্তি! চোরের মতো আসা···তেমনি চোরের মার খেয়েছে! নড়বার সামর্থ্য নেই! সর্ব্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ··· লেবেল-আঁটা পার্শেলের মতো···ছাদের উপর চিলকোঠায় পড়ে আছে।

কিরণ বললে—বলো কি!

—হ্যাঁ, দেখবে এসো।

সারাদিন বাচস্পতি আর কিরণ নানাভাবে মথুরামোহনের সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছেন···নানাভাবে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা! কিন্তু ফল হয়েছে পাথরের গায়ে হাতুড়ি ঠোকার মতো। তাঁদের কথার একটি পেরেক সে-পাহাড়ে বসতে পারেনি!

বৈকালে বাগানে সেই বেদীতে আসর। আসরে মথুরামোহন এবং

বাচস্পতি—তাঁদের সঙ্গে কিরণ আর শচী। মথুরামোহন একা একদিকে…এঁরা তিনজনে এক হয়ে অন্যদিকে। যুক্তি-তর্কের তীর ছুটছে উভয় পক্ষে। এপক্ষের তীরগুলো মথুরামোহনের একরোখা গদায় খান্-খান্ হয়ে যাচ্ছে…কোনোটা মথুরামোহনকে স্পর্শ করতে পারছে না!

সুদৃঢ় কণ্ঠে মথুরামোহন বললেন—না, না, তুমি বুঝছো না বাচস্পতি, ঐ হরিদ্বার কনখলের কথা—ও-সব মিথ্যা…বানানো গল্প। চক্রান্ত!

বাচস্পতি বললেন—চক্রান্ত!

—হ্যাঁ। দুজনে দুজনকে জানে।

নাকে একটিপ নস্য গুঁজে খুব সহজ এবং শান্ত স্বরে বাচস্পতি বললেন—আজ্ঞে, জানা খুব স্বাভাবিক!

মথুরামোহন চমকে উঠলেন! বললেন—স্বাভাবিক?

বাচস্পতি বললেন—নিশ্চয়। চাঁপাদিদিকে আপনি আশ্রয় দেছেন, এ-কথা শচীদিদি বাসুকে লেখেননি, ভাবেন?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মথুরামোহন তাকালেন বাচস্পতির দিকে। বাচস্পতি বললেন—নিশ্চয় লিখেছেন। এবং চাঁপাদিদি এখানে এসে জেনেছেন, বাসু আপনার ছেলে…কলকাতায় আছে…কলেজে পড়ে। কাজেই দুজনের দুজনকে জানবে বৈ কি!

বাচস্পতির কথার শেষটুকু লুফে নিয়ে কিরণ বললে—হ্যাঁ। কাজেই দুজনকে দুজনের জানা স্বাভাবিক।

মথুরামোহন কেমন হতভম্ব! মনে হলো, হুঁ। কিন্তু

তিনি বললেন—বেশ! কিন্তু বাড়ীতে নিজের ঘর থাকতে গভীর রাত্রে অমন করে এসে অনাত্মীয়া কিশোরী কুমারী… তাঁর ঘরে…

বাঁ হাতের তেলোয় খানিকটা নস্য ছিল, সেটুকু ডান হাতের আঙুলের

টিপে বাচস্পতি নাকে গুঁজলেন—গুঁজে বেশ একটু জোর-গলাতেই তিনি বললেন—আহাহা, আত্মরক্ষা…

—আত্মরক্ষা! মথুরামোহনের কণ্ঠে তীব্র বিস্ময়।

উৎসাহিত কণ্ঠে বাচস্পতি বললেন—হ্যাঁ, আত্মরক্ষা! রাত্রে বাড়ী আসছে…হঠাৎ ওই ব্যাপার…বটার হল্লায় আপনার ঘুম ভেঙ্গে যাবে… তাই আত্মরক্ষার জন্য বাসু সামনে যে-ঘর পেয়েছে, অর্থাৎ চাঁপাদিদির ঘরে প্রবেশ করেছে। এবং দুজনের কেউ কাকেও আগে কখনো দেখেন নি…চেনেন না…জানেন না…

বাচস্পতির কথায় ফোড়ন দিয়ে কিরণ বলে উঠলো—ঠিক! ঠিক! তাই দুজনে দুজনকে দেখবামাত্র পরিচয়।

বাচস্পতি বললেন—সদাচার!…শিষ্টাচার।…মানে, বটা চোর-চোর বলে চেঁচিয়েছে, তাতে চাঁপাদিদির ঘুম ভেঙ্গে গেছে…তাই ভয় পেয়ে উঠে সামনেই তিনি দেখেছেন বাসুকে! ভেবেছেন, চোর! হয়তো চেঁচাবেন…আপনি অসুস্থ মানুষ…পাশের ঘরে আছেন…তাতে আপনার ঘুম ভেঙ্গে যাবে…তাই বাসু তাঁকে তখনি দেছে পরিচয়। কাজেই দুজনে জানাজানি।

কথাটা বলে বাচস্পতি বেশ বড় করে এক টিপ নস্য নাকে গুঁজলেন।

শচী বললে—সত্যি বাবা, সব কথা সঠিক না-জেনে তুমি ভয়ানক অবিচার করেছো!

বাচস্পতি বললেন—ঠিক কথা! এবং এই অতি-সহজ স্বাভাবিক কথাটুকু না বুঝে আপনি যা করেছেন…আপনার চাকর-বাকরদের মুখে-মুখে সেটা চারিদিকে কতখানি কদর্য্য কুৎসার সৃষ্টি করবে, ভাবুন তো!

মথুরামোহনের মনে রীতিমত অস্বাচ্ছন্দ্য! নিরুপায়ের কণ্ঠে তিনি বললেন—হুঁ!

বাচস্পতি তাঁর এই নিরুপায় ভঙ্গী লক্ষ্য করলেন, করে বললেন—চাঁপাদিদি অসহায় অনূঢ়া কুমারী···এই কদর্য্য কুৎসার ফলে এর পর ওঁর বিবাহ? এ-কথা শুনে কে ওঁকে বিবাহ করবে? অথচ আপনি ওঁকে ভালো করেই জানেন! অমন ভালো মেয়ে···এই কলি-যুগে···এখন তাঁর বিবাহ···

বেশ একটু গাঢ়কণ্ঠে শচী বললে—সত্যি বাবা,বাঙালীর ঘরের মেয়ে···

শচীর কথার খেই ধরে বাচস্পতি বললেন—নিশ্চয়! বাঙালীর ঘরের মেয়ে···বিবাহ ভিন্ন তার গতির্নাস্তি, গতির্নাস্তি, গতির্নাস্তি কলি-যুগে!

উদ্বেগে মথুরামোহন রীতিমত আকুল!

বাচস্পতি বললেন—শ্যামসুন্দরের সেবায়, আপনার শুশ্রূষায় চাঁপাদিদি আপনাকে কতখানি···আর আপনি কিনা ওঁকে এমন কলঙ্কের পঙ্কে···

কিরণ বললে—এবং এ কুৎসায় আপনার বংশের কলঙ্ক কতখানি। সকলে বলবে, আপনার ছেলে বাসু···তার সঙ্গে চাঁপার হয়তো···অথচ ওরা দুজনেই নির্দ্দোষ নিরপরাধ।

মথুরামোহনের মনে হলো, তিনি যেন শূন্যে ঝুলছেন! নিরুপায়ে এঁদের পানে তাকিয়ে তিনি চুপ করে রইলেন।

বাচস্পতি বললেন—কুমারীর অমর্য্যাদা···কুমারীর উপর এই অবিচার ···শ্যামসুন্দরকেও আঘাত করেছে। তাঁর মুখে আজ সে-হাসি দেখেছেন? কেমন মলিন তাঁর মুখ!

মথুরামোহনের মনে হলো, তিনি যেন নিজের হাতে শ্যামসুন্দরের গায়ে আঘাত করেছেন! হতাশ দৃষ্টিতে তিনি বাচস্পতির পানে চেয়ে···

বাচস্পতি বললেন—অথচ আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন, শ্যামসুন্দরের ঐ মলিন মুখ চাঁপাদিদির সেবায় কী অপরূপ আভায় সমুজ্জ্বল থাকতো! আর আজ?

মথুরামোহন নিশ্বাস ফেললেন। বললেন—এর প্রতিকারের কোনো উপায় ?

নাকে নস্য গুঁজে একটু চিন্তা করছেন, এমনি ভাব দেখিয়ে বাচস্পতি বললেন—প্রতিকার !···তারপর একটা নিশ্বাস। নিশ্বাস ফেলে আবার বললেন—হতে পারে। একটিমাত্র উপায়···এবং সে উপায় আপনার হাতে।

মথুরামোহনের শরীরে রোমাঞ্চ ! মথুরামোহন বললেন—আমার হাতে ?

বাচস্পতি বললেন—হ্যাঁ। মানে, আপনার বাস্তুর সঙ্গে যদি চাঁপাদিদির বিবাহ···

এ উপায়ের কথা মথুরামোহনের মাথায় আসে নি···আসতে পারে না ! সবিস্ময়ে তিনি বললেন—বিবাহ ?

বাচস্পতি বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, বিবাহেই কুৎসার উচ্ছেদ এবং সকলের মর্য্যাদা রক্ষা ! অর্থাৎ সর্ব্বাপদঃ শান্তি।

মথুরামোহনের মনের মধ্যে যেন ছোট-খাট যুদ্ধ ! সংস্কার আর সুনাম-রক্ষা···দুপক্ষে যুদ্ধ। কণ্ঠে ঈষৎ দ্বিধা···মথুরামোহন বললেন—কিন্তু অষ্টমা গৌরী···

বাচস্পতি বললেন—কোনো বাধা নেই। শাস্ত্র স্পষ্টাক্ষরে বলেছে, চার্বঙ্গী কিশোরী বধূ ! তার উপর পুরাণের নজীর···স্বয়ং পার্ব্বতী, সাবিত্রী···দময়ন্তী···

মথুরামোহনের মন এ-কথায় একবার পুরাণের পাতাগুলোয় বিচরণ করে এলো। উকিল যেমন কেতাব পড়ে নজীর খোঁজে, ঠিক তেমনি দৃষ্টি নিয়ে তাঁর বিচরণ ! যেন কূল পেলেন ! মথুরামোহন বললেন—হুঁ। কিন্তু আমার চাঁপা-মা···তাঁকে আজ সারাদিন দেখিনি তো !

শচী বললে—আমি দেখছি। বলেই শচীর সবেগে নিষ্ক্রমণ।

মথুরামোহন ভাবছেন…কত কি ভাবছেন…হঠাৎ বললেন—তাহলে বাচস্পতি, পাঁজি…

বাচস্পতি তাকালেন বটার দিকে, বললেন—পাঁজিখানা নিয়ে এসো বটুকচাঁদ।

বটা ছুটলো পাঁজি আনতে। মথুরামোহন বললেন—পাঁজি এলে তুমি ত্যাখো বাচস্পতি, শুভদিনের নির্ঘণ্ট।

চাঁপা মলিন মুখে দাঁড়িয়ে মন্দিরের ধারে…একটা ফুলগাছের পাতা ছিঁড়চে…মন উদাস…শচী এলো ছুটে, ডাকলো—চাঁপা…

চাঁপা ফিরে তাকালো। চাঁপার হাত ধরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শচী বললে—আয়…আয়…শীগ্‌গির…

চাঁপা বললে—কোথায়?

শচী বললে—আমার সঙ্গে…বাবা ডাকছেন।

পাঁজি খুলে বাচস্পতি বললেন—হ্যাঁ, সামনের এই পঁচিশ তারিখ… গোধূলি লগ্ন…সূতহিছুক যোগ…খুব প্রশস্ত।

কিরণ বললে—তাহলে ঐ তারিখেই। মানে, তাহলে আমাদের দুজনকে আবার পাল্টে আসতে হবে না। একেবারে এই যাত্রাতেই শুভ কাজ সেরে…

মথুরামোহন বললেন—তাহলে বুঝলে বাচস্পতি, ঐ তারিখেই… হ্যাঁ! তুমি ঠিক বলেছো, আমার শ্যামসুন্দর…

চাঁপাকে নিয়ে শচী সামনে এসে দাঁড়ালো। মথুরামোহন দেখলেন; দেখে বললেন—এই যে, এসো মা, আমার কাছে এসো।

চাঁপা কাছে এলো। চাঁপার হাত ধরে তাকে কাছে বসিয়ে চাঁপার পিঠে হাত রেখে বললেন—আজ আমাকে তোমার ঐ বদরী-চূর্ণ দাওনি তো মা;—তাছাড়া আমার শ্যামসুন্দরের পূজার আয়োজন?

বিনম্র মৃদুকণ্ঠে চাঁপা বললে—আপনি বারণ করেছেন!

অপ্রভিতকণ্ঠে মথুরামোহন বললেন—ও হ্যাঁ…আমার মতিভ্রম হয়েছিল। আর কখনো হবে না। আজ থেকে আমার শ্যামসুন্দরের ভার চিরকালের জন্য তোমার হাতে দিলুম…আর সেই সঙ্গে…

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়লো…শচীদের দিকে চেয়ে মথুরামোহন বললেন—বাসু? বাসু কোথায়?

কিরণ বললে—ঠিক তো! বাসু কোথায়? এসে পর্য্যন্ত বাড়ীতে তার টিকি দেখিনি।

সব কথা মথুরামোহনের মনে পড়লো। তিনি একটু লজ্জা পেলেন। কুণ্ঠিত স্বরে তিনি বললেন—হুঁ! কাল রাত্রে তাকে আমি…

বাচস্পতি বললেন—তাই তো, বিবাগী হয়ে গেল না তো?

মথুরামোহন রীতিমত উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি বললেন—বিবাগী! তাঁর বুকখানা রীতিমত কেঁপে উঠলো!

শচী বললে—বিবাগী হয়ে কোথায় যাবে? যে মার খেয়েছে… নড়বার সামর্থ্য নেই! চিলকোঠায় পড়ে আছে।

মথুরামোহন চমকে উঠলেন, তিনি বললেন—ও…বটে…চলো, চলো…আমি এখনি যাবো! বাসুকে আমি…রাগের মাথায় …ছি-ছি-ছি…

বাচস্পতি বললেন—এইজন্যই শাস্ত্রে বলেছে, রাগ চণ্ডাল।

চিলকোঠার ঘরে বাসুকে দেখে মথুরামোহনের অস্বস্তির সীমা নেই! তিনি বললেন—সর্ব্বাঙ্গে খুব বেদনা?

বাসু মাথা নামালো··কোনো জবাব দিলে না। মথুরামোহন বললেন—হতভাগাদের জরিমানা করবো! দেখা নেই, শোনা নেই··অমন করে মারা! কাকে মারছিস্, দেখ্‌বি না? না, আমি কারো কথা শুনবো না·সকলের জরিমানা। তিনি তাকালেন বাসুর দিকে। বাসুর হাত ধরে তাকে তুললেন: বাসুর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—আমার মতিভ্রম·আহা-হা-হা।

বাচস্পতির দিকে চেয়ে মথুরামোহন বললেন—এখন তাহলে?

বাচস্পতি বললেন—কি, তাহলে?

মথুরামোহন বললেন—আমি যে স্থির করলুম, শ্রাবণ মাসের ঐ তারিখে আমার চাপা-মায়ের সঙ্গে বাসুর···

বাচস্পতি বললেন—তাতে বাধা কি?

মথুরামোহন বললেন—বাসুর এই অবস্থা··নড়বার সামর্থ্য নেই। তাঁর কণ্ঠ উদ্বেগে আকুল।

বাচস্পতি বললেন—ভাবনা কি? যাঁর বাক, তিনিই উপায় করবেন। মানে, আমাদের চাপাদিদি! ওঁর কাছে নিশ্চয় সাধুবাবার কোনো ওষুধ···

মৃদু হেসে শচী বললে—ঠিক বলেছো বাচস্পতিদা··কি চাপা, নেই? বলেই চাঁপাকে সবার অলক্ষ্যে ছোট একটা চিমটি!

চাঁপার চোখে হাসির ঝিলিক মথুরামোহনও চাঁপার পানে চেয়ে ···আকুল কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন—আছে মা এমন ওষুধ? বাসুর এই যন্ত্রণা···

লজ্জায় চাঁপা মাথা নামালো। শচী বললে—আমি জানি, ও একদিন বলছিল বাবা…

মথুরামোহন খুশী হলেন, বললেন—আঃ…নিশ্চিন্ত হলুম মা! তাহলে তুমি…হ্যাঁ…তিনি তাকালেন বাচস্পতির দিকে, বললেন—ওই তারিখই পাকা…বুঝলে বাচস্পতি…আর দেরী নয়। শুভস্য শীঘ্রম্।

শেষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬